ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের স্বত্বলোভীদের প্রতি

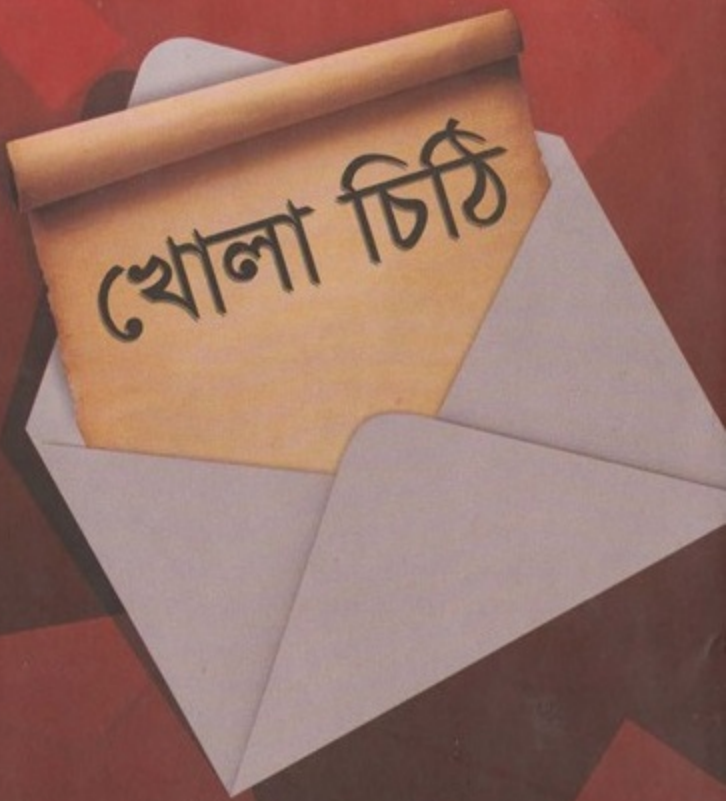

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও
মুক্তিযুদ্ধের সত্বলোভীদের প্রতি

খোলা চিঠি

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

ইস্ট-ওয়েস্ট পাবলিকেসন্স

www.icsbook.info

@ প্রকাশনায়:

এম হক
রাসেল স্ট্রীট-ইউকে

প্রকাশকাল:
প্রথম প্রকাশ : মার্চ-১৯৯৭, পঞ্চম প্রকাশ : এপ্রিল-২০১২

অক্ষর বিন্যাস: জননী কমপিউটার্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে : সালমানি প্রেস, ৩০/৫, নয়াবাজার, ঢাকা।
প্রচ্ছদ : নাহিদ সরোয়ার

বিনিময় : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-2-8494-048-6

www.icsbook.info

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধির
দুই পথিকৃৎ
আহমদ ছফা
মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে স্থান দেয়নি তদানীন্তন সরকার
এবং
ফরহাদ মজহার
যিনি কোন দল বা মহলের কাছে বিক্রি করেননি তাঁর মস্তক

www.icsbook.info

সূচীপত্র

- কেন এই খোলা চিঠি ৫
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বয়ান ৯
- প্রশ্নমালা : জবাব একদিন দিতেই হবে ১৪
- বস্তুগত ও ইতিহাসের সত্য ৯৫
- আর এস এস-এর মিশন ১১৪
- শেখ হাসিনার সাথে বিবিসি সাক্ষাৎকার ১১৬
- জে.এন. দীক্ষিতের সাক্ষাৎকার ১১৮
- আমার ফাঁসি চাই ১২০
- অন্নদাশঙ্কর রায় ও অন্যান্য ১৩১
- শেষ কথা ১৩৫

www.icsbook.info

কেন এই খোলা চিঠি

বিগত দু'শ বছরে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বহু দেশই রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করেছে; বহুদেশে সাধিত হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লব। এইসব স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে পক্ষবিপক্ষ কারো মধ্যেই কখনো কোন দ্বিমত দেখা দেয়নি। কারণ বাস্তবে যা ঘটেছে, যা ঘটতে মানুষ দেখেছে, সেটাই হয়েছে তাদের ইতিহাসের অন্তর্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও জর্জ ওয়াশিংটনের ভূমিকা থেকে শুরু করে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিক (RSDLP) দল ও লেলিনের ভূমিকা কিংবা ইরানের বিপ্লব (১৯৭৯) ও ইমাম খোমেনীর ভূমিকা পর্যন্ত কোন স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ইতিহাস নিয়েই কারো মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই।

কিন্তু বিশ্বের একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস। স্বাধীনতার ৩২ বছর পরও এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হয়নি; সম্ভবপর হয়নি আমাদের জাতীয়তাসহ অনেক ইস্যুরই স্বরূপ নির্ধারণ।

রক্তমূল্যে অর্জিত বিপ্লব বা স্বাধীনতার মূল্যে যাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন, তাঁদেরই পবিত্র দায়িত্ব দাঁড়ায় মিথ্যাকে সত্য এবং কল্পনাকে বাস্তব বলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা। তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হয় না এবং ইতিহাসও তার আপন গতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এই নিরপেক্ষতা বজায় থাকেনি বরং মুক্তিযুদ্ধকালীন দুর্বলতা সমূহকে ঢাকতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃতিত্ব কুক্ষিগত করা, গোষ্ঠী স্বার্থে দলের ও দলীয় নেতার কাল্পনিক মাহাত্ম্য সুপারইম্পোজ করা এবং ক্ষমতা ও গোষ্ঠী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করার সন্ত্রাসী প্রবণতার নীচে বস্তুবাদী ও ইতিহাসের সত্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই চাপা পড়ে যায়।

সেদিন যাঁরা তাঁদের কায়েমী স্বার্থ এবং বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাসকে জাতির ঘাড়ে জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সেই ভূমিকা আজো অব্যাহত আছে এবং বর্তমান প্রজন্মের কিছু অংশ হলেও তাঁদের এই তৎপরতার ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও ইতিহাসকে বিকৃত করছেন। এরা বস্তুতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি, মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণও করেননি, অথচ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব এককভাবে আত্মসাৎ করতে উদ্যত হয়েছেন। এরা জন্মলগ্নেই বাংলাদেশের অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশপ্রেম ও জনগণের সোল এজেন্সি দাবী করেছেন। এরা যে ভয়ংকর এক দলীয় ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের প্রবর্তন করেছিলেন, সেটাকেই বলছেন মহত্তম গণতন্ত্র।

বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের ধ্বংসের পর সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-উগ্র-হিন্দুত্ববাদের বর্তমান আঘাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। এরা বাংলাদেশে এই সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ, হিন্দুত্ববাদেরই বিশ্বস্ত দোসর হিসাবে কাজ করেছেন এবং ইসলামের ওপর একের পর এক আঘাত হেনে চলেছেন।

www.icsbook.info

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধও ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের মুক্তির সংগ্রাম। অতএব, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগে ইসলামের দ্বন্দ্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এরা মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামকে পরস্পর বিধোরী ও সাংঘর্ষিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ভারত বাংলাদেশকে তার পণ্যের একচেটিয়া অবৈধ বাজারে পরিণত করার মাধ্যমে তথা পণ্য আগ্রাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পসম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভারত গঙ্গা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র সহ প্রতিটি নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পরিণত করে দিচ্ছে মরুভূমিতে। শান্তিবাহিনী ও বঙ্গসেনা সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে খন্ডবিখন্ড করে দেওয়ার তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক নাম দিয়ে হামলার পাঁয়তারা করছে। আর এরা ভারতের এই সব তৎপরতার প্রতিই সর্বাত্মক সমর্থন যোগাচ্ছেন। উস্কানি দিচ্ছেন।

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস বলেছিলেন, **"কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে, আগে সে জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও।"** এই নীতির অনুসরণে সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-হিন্দুবাদ ও তাদের বাংলাদেশী দোসররা মুসলমান অধ্যুষিত এই ভূখন্ডের হাজার বছরের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনগণ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মূলত; এই চেতনাবোধ থেকেই রুখে দাঁড়িয়েছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে রাষ্ট্র পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত শোষণ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে অবহেলিত-বিড়ম্বিত। ৮৭% মানুষ বাধ্য হচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে মানবেতর জীবন যাপন করতে। ০.৫% মানুষের হাতে পূঞ্জীভূত হয়েছে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৭০%। বেকারত্ব, ঘুষ, দুর্নীতি, খুন-হাইজ্যাক-রাহাজানি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি আজ সর্বকালের সব রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। ২০০১-২০০২-২০০৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বের ১নং দুর্নীতিবাজ দেশ হিসাবে। অথচ এর জনগণের দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নন-ইস্যুকে ইস্যু করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে। এরা শোষণ-বৈষম্যের অবসানের জন্য আন্দোলন করে না, দ্রব্যমূল্য হ্রাস কিংবা বেকারত্ব দূরীকরণের জন্যও আন্দোলন করে না, আন্দোলন করে না গঙ্গা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র বাঁধ নির্মাণ কিংবা তালপট্টি দ্বীপ দখলের বিরুদ্ধে, আন্দোলন করে না বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এর কবল থেকে দেশের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। এরা চায় সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-হিন্দুত্ববাদের স্বার্থে এবং নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে শুধুই নৈরাজ্য, শুধুই অস্থিতিশীলতা। তাইতো এরা পার্লামেন্টের মধ্যে পর্যন্ত সদম্ভে ঘোষণা করে, তারা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 'গণ আদালত ছাড়া অন্য কোন আদালত মানে না। তাই তো এরা উচ্চআদালতের বিচারকদের লাঠি মারার হুমকি দেয়।

www.icsbook.info

বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তিনি তাঁর স্বকীয় চিন্তাচেতনার কাঠামোর মধ্যে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আজীবনই সংগ্রাম করে গেছেন। চূড়ান্ত বিচারে দেখা যাবে যে, তাঁর চিন্তা চেতনা ও কর্মকান্ডের মধ্যে বাস্তবিকই কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। অথচ এরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ভাবমূর্তিকে তাদের সকল অপকর্মের শিখন্ডি হিসাবে ব্যবহার করছে এবং তিনি যা ছিলেন না ও তিনি যা করেননি, তাঁর ওপর তাই চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে ইতিহাসের ভাঁড়ে পরিণত করতে চাইছে।

এই চূড়ান্ততম মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি, চক্রান্ত ও নৈরাজ্যের কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে সম্ভব নয় এ জাতির সার্বিক মুক্তি, সম্ভব নয় মহান মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন, সম্ভব নয় লাখো শহীদের রক্তের ঋণ পরিশোধ।

তাই, দেশ ও জাতির সামনে আজ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার পটভূমি কি ছিল, কার কি অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধে, বিজয়ের পর কে কি ভূমিকা পালন করেছেন, কে বা কারা দায়ী দেশ ও জাতির বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার জন্য। স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকদর্শন। এই লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন বা উপহাস করার জন্য নয়, কোন গোষ্ঠী স্বার্থে কাউকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেও নয়; বরং বিচারপতি এম, আর, কায়ানী যাকে বলেছেন 'হোল ট্রুথ বা সার্বিক সত্য, সেই সার্বিক সত্যকে সত্য-মিথ্যার বর্তমান ঘূর্ণাবর্ত থেকে ছেঁকে আলাদা করার লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরংকুশ সত্যের মুখোমুখি উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্যের অর্থ বা তাৎপর্য এও নয় যে, সব দোষ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুক্তি যুদ্ধের চেতনার একচ্ছত্র দাবীদারদেরই আর যাঁরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারক বা নিজেদের ইসলামনিষ্ঠ বলে তুলে ধরতে ব্যস্ত তাঁরা সবাই ধোঁয়া তুলসী পাতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁদের অনেকের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। অনেকেই হানাদারদের দোসরবৃত্তি করেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কারক হয়েছেন, কারক হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মা-বোনের নির্মম ধর্ষণের এবং বাংলাদেশের খেয়ে পরে এখনো এঁদের কেউ কেউ দাবী করেছেন যে ১৯৭১-এ তাঁরা যা করেছেন সেটাই সঠিক ছিলো। বলাবাহুল্য, এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি অনাস্থা, বাংলাদেশের প্রতি অনাস্থা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননারই সামিল। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এঁরাও কোন অংশে কম দায়ী নন। কিন্তু সেটা ভিন্ন আলোচনা।

www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বয়ান

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Sovereignty of Reason বা যুক্তির সার্বভৌমত্ব। এটা যাঁরা মানেন না সভ্যসমাজ এঁদেরকে অর্বাচীন, অন্ধ, বর্বর বলেই বিবেচনা করে। কিন্তু, বাংলাদেশের ব্যাপারটা যেন অনেকটাই উল্টো। এখানে যাঁরা মুক্তবুদ্ধি, প্রগতিশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি-মুক্ততার দাবীদার, তাঁরাই যেন সর্বাধিক যুক্তিবিবর্জিত, অন্ধ, গোঁড়া ও একদেশদর্শী। এঁদের বিচারে অনেক কালোত্তীর্ণ ও শাশ্বত বিষয়ও প্রতিক্রিয়াশীল, আবার অনেক স্বল্পায়ু, অসত্য অর্ধসত্য বা ইতিহাসের কবরে প্রোথিত বিষয়যাদিও প্রগতিশীল।

বাংলাদেশে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা (যার আভিধানিক অর্থ ধর্মহীনতা) ও মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদার তাঁদের মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষ। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মের প্রতি ভক্তি ও সহিষ্ণুতা;

২. ভারত ও হিন্দুত্ববাদীদের তাবৎ কর্মকান্ডের প্রতি অন্ধ অনুরাগ;

৩. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মৌরসী সত্ব দাবী ও বাংলাদেশকে পৈত্রিক সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা;

৪. ১৬.১২.১৯৭২ থেকে ১৫.৮.১৯৭৫ এবং ১৯৯৬-২০০১, যেই দুই আমলে আওয়ামী লীগ বাকশাল ক্ষমতায় ছিলো, সেই দুই আমলকেই বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ বলে প্রচার এবং

৫. নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড ও ধ্যানধারণাকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম, ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিসত্বাকে শিখন্ডী-স্বরূপ ব্যবহার।

এই শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল ও সগর্ব মৌল বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. একথা সবাইকে মানতেই হবে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, স্থপতি ও জাতির পিতা। সবাইকে স্বীকার করতেই হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের সর্বস্বত্ব ও কৃতিত্ব একমাত্র আওয়ামী লীগের ও ওই দলের নেতাকর্মীদেরই। একথাও সবাইকে মানতেই হবে যে, ১৯৭২ এর বিজয় দিবস থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট এবং ১৯৯৬-২০০১ আমলই ছিলো বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময়, এই দুই সময়ে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-তৃপ্তির কোন সীমা সাক্ষ্যই ছিলোনা। সর্বোপরি, এই দু'টি আমলই ছিলো উদার ও উৎকৃষ্টতম গণতন্ত্রের মডেল। এটা যারা মানবেনা, তারা অবশ্যই রাজাকার-আলবদর, এমনকি

www.icsbook.info

তারা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সম্মুখ যোদ্ধা হলেও। এই সব বিষয় সবাইকে যেকোন মূল্যে মানতে বাধ্য করার ব্যাপারেও তাঁরা বদ্ধ পরিকর।

২. আওয়ামী লীগই একমাত্র গণতান্ত্রিক সংগঠন, আর সবাই স্বৈরাচারী। যারা এই দল ও দলনেত্রীর নিঃশর্ত সমর্থক শুধু তারাই মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক, এমনকি তারা ১৯৭১এর হানাদারদের চিহ্নিত দোসর হলেও। অপর দিকে যারাই এদল করবেনা, তারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, এমনকি তারা মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসের জন্য বীরোত্তম, বীরবিক্রম বা বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত হলেও। যে একুশ বছর এই দল ক্ষমতায় ছিলোনা সেই একুশ বছরই হলো ভয়ংকর স্বৈরাচারী আমল, আর এই দল দু'মেয়াদ সময়ে ক্ষমতায় ছিলো (বাকশাল আমলসহ) সেই দুই আমলই হলো পূর্ণ গণতন্ত্রের সুখময় আমল।

৩. আওয়ামী লীগরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে, সুতরাং এই দেশটা আওয়ামী লীগারদেরই পৈত্রিক সম্পত্তি (এ বি এম মুসা একটি প্রবন্ধে এরকম কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন); অতএব এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অন্য কোন দলের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়, যতোই তারা জনগণের সমর্থন ও ভোট পাকনা কেন।

৪. আওয়ামী লীগ আমলে অমুসলমানরা, বিশেষত হিন্দুরা ছিলো মহা স্বর্গ সুখে। অন্যান্য আমলে হিন্দুদের ওপর এমন হত্যা ও নিপীড়ন চালানো হয়েছে, যার দ্বিতীয় কোন নজীর উপমহাদেশের গোটা ইতিহাসেই নেই। ভারতে মুসলমানদের যে কচু কাটা করা হচ্ছে সেটা খুবই যথার্থ। অমুসলমানগণ কর্তৃক মুসলমানদের হত্যা করা এবং মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করাই মৌলবাদ দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় বিধায় তা সমর্থনযোগ্য। ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা করছে সেটাও যথার্থ। সুতরাং, ইহুদীবাদী ও ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে একাত্মতাও যথার্থ।

৫. গত ৫৬ বছরে ভারতে প্রায় ১৮ হাজারটি মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, এসব দাঙ্গায় প্রায় ৪ লক্ষ মুসলমান নিহত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে অন্ততঃ দু'লক্ষ মুসলিম নারী, হিন্দুত্ববাদীরা বাবরী মসজিদসহ শতশত মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে, ৭১-৭২ সালে ভারতীয়রা প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে লুটে নিয়েছে, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করেছে, বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে, বাংলাদেশের তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নিয়েছে, ২ কোটি ভারতীয়কে বাংলাদেশে পুশইন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে, পণ্য আগ্রাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দিয়েছে, শান্তি বাহিনী ও বঙ্গসেনাদের সৃষ্টি ও লালন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে, ভারতীয় লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ স্বরূপ প্রতিটি মুসলিম নাম ও

www.icsbook.info

ইসলামী শব্দকে ব্যতিক্রমীভাবে বিকৃত করে চলেছেন (যেমন, সুরাবর্দী, সুকর্ণ, সেখ মজিবর, মহম্মদ, জিনত অমন, অমজদ আলী খান, সুরৈয়া, রোশেনারা, সাহালাম, নেমাজ, আভা বসু রচিত উপন্যাস 'জন্নত থেকে জহন্নম', বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'খাঁ ইতিবরের রোজ নামচা ইত্যাদি) এবং করছে এমনি আরো অনেক কিছু। হিন্দুত্ববাদীদের উপরোক্ত সমস্ত কাজই হলো অমৌলবাদী, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ। সুতরাং, বাংলাদেশের প্রতিটি সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন মানুষের পবিত্র কর্তব্য হলো ভারত ও ভারতীয়দের ইত্যাকার সকল কর্মকান্ডের প্রতি বিনা প্রশ্নে অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করা। যারা ভারতীয় মুসলিম নিধন ও উপরোক্ত কর্মকান্ডের সমালোচনা করবে, তারা অবশ্যই মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, রাজাকার-আলবদর ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী।

৬. তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত যতো গোলাগুলি, বোমাবাজি, খুন-খারাবি হচ্ছে, তার সবই করছে আওয়ামীলীগ বিরোধীরা, বিশেষতঃ মৌলবাদীরা। যেমন, ১৯৯৩ সালের ২৪ জানুয়ারী চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে শেখ হাসিনার দলেরই দু'গ্রুপ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়; এ পর্যায়ে দলের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরী দু'গ্রুপের মাঝখানে বসে পড়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, স্বয়ং শেখ হাসিনা ও হাজার হাজার মানুষ যা নিজনিজ চোখে দেখেছেন, তা আসলে সত্যি নয়। সত্যি হলো এই ঘটনার জন্যও দায়ী মৌলবাদীরা। যদিও বিচারপতি আবদুল বারী কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক রমনা বটমূল, যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান, নারায়ণগঞ্জের আওয়ামীলীগ অফিস ইত্যাদিতে বোমাবাজীর সব ঘটনাই ছিলো আসলে আওয়ামী লীগারদেরই সাজানো নাটক, তবু এ রিপোর্টকে সত্য বলে মানা যাবে না; বরং এটাই মানতে হবে যে এ সমস্ত সকল ঘটনা মৌলবাদীরাই ঘটিয়েছে, এটা প্রমাণ করা যতোই অসম্ভব হোকনা কেন।

৭. বিশ্বের একমাত্র মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও ঘৃণ্য ব্যাপার হলো ইসলাম। সর্বশক্তিমান নিরাকার এক আল্লাহর বিশ্বাসই হলো অবৈজ্ঞানিক, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু হস্তীমুখ বা দশভূজা দেবদেবীদের উপাসনা সম্পূর্ণ অমৌলবাদী, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁদের মতে ইসলাম পরম ঘৃণ্য ব্যাপর হলেও আওয়ামী লীগাররা বা তাঁদের নেত্রী যে এক একটা নির্বাচনের সময় ভোট পাওয়ার জন্য উমরাহ হজ্ব করেন, তসবী জপেন কিংবা নৌকার মালিক তুই আল্লাহ জাতীয় শ্লোগানের আশ্রয় নেন, তা খুবই গ্রহণীয়। এজন্য যে এটা একটা নির্বাচনী কৌশল বা ষ্ট্যান্ট মাত্র। মুসলমানদের কি করণীয়; কি বর্জনীয়, এ সম্পর্কে রায় ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার এক্তিয়ারও একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরই।

www.icsbook.info

৮. মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বণি বেশ্যাদের খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য (শামসুর রাহমান), দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আযান অসহ্য (কবীর চৌধুরী), মোহাম্মদ তুখোড় বদমাষ চোখে মুখে রাজনীতি (দাউদ হায়দার), আমাদের উচিত রবীন্দ্রনাথের এবাদত করা (সুফিয়া কামাল), তসলিমা নাসরিনের কবিতা "ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে/জিবরাইলের কাশি/মুনকার আর নকীর গেছে/ হুরের নিয়ন্ত্রণে/ফেরেশতারা যে যার মতো সাত আকাশে ঘুরে/ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে শিঙ্গা ফুঁকবে কে?", "মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব সমার্থক, প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে শুধুমাত্র ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে" (আহমদ শরীফ, যিনি ১৯৭৭ সালে যুগযন্ত্রণা শীর্ষক গ্রন্থে ঘোষণা দেন "আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করিনা এবং ১৯৯২ সালে বলেন আল্লাহর আসলে কোনই অস্তিত্ব নেই এবং ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকদের নিছক শয়তানী মাত্র), "খোদা নেই, কোরআন বাজে, রাবিশ" (বদরুদ্দিন উমর) ইত্যাদি উক্তি খুবই যথার্থ। তবে ইহুদীবাদ বা হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ভয়ংকর অপরাধ। কারণ তাদের সব গ্রন্থ, সব বক্তব্য, সব বিশ্বাস ও সব কর্মকান্ডই যথার্থ।

৯. বাংলাদেশ মার্কস, লেলিন, মাও, রুশো, ভল্টেয়ার, ম্যাকিয়াভেলী, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী, বুশ, টনি ব্লেয়ার, ইন্দিরা গান্ধী, বাজপেয়ী, আদভাণী, বাল থ্যাকারে প্রমুখ যে কারো মত বা পথ অনুসরণে কোনই বাধা নেই। এদেশে বরদাস্ত করা যাবেনা শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ।

১০. ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আসলে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলো, কিন্তু 'সুক্ষ্ম কারচুপি'র মাধ্যমেই তাদেরকে সেবার হারিয়ে দেওয়া হয়। আর, ২০০১-এর নির্বাচনে দেশের প্রেসিডেন্ট, কেয়ার টেকার সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপির সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে "সুক্ষ্ম ও স্থুল কারচুপির" মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পরিস্কার বিপুল বিজয় ছিনিয়ে নেয়, আওয়ামী লীগের দেওয়া বেড়াই আওয়ামীলীগের ক্ষেত খেয়ে +ফেলে (শেখ হাসিনার দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য)।

১১। ২০০১ সালে নির্বাচিত বিএনপি জোট সরকার একটি তালেবানী সরকার, সাম্প্রদায়িক সরকার, দেশকে ডুবিয়ে দেওয়ার সরকারতো বটেই। তাই ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত প্রমুখ শক্তি যাতে আফগানিস্তানের কায়দায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে এই সরকারকে উৎখাত করে দেয়, সেই লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রোপাগান্ডা ও উস্কানিই এই সময়ের (২০০১-২০০৬) যথার্থ গণতান্ত্রিক কাজ।

একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনির্ভর জরীপ চালালে হয়তো দেখা যাবে যে বাংলাদেশে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে সোচ্চার, এদের প্রায় সকলেই ইয়াংকীবাদ-ইহুদীবাদ ও

www.icsbook.info

হিন্দুত্ববাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বেনিফিশিয়ারী এবং তাঁদেরই করুণা-অনুকম্পা নির্ভর। অনেকে এটাও মনে করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতির নামাবলীর আবরণে এঁরাই প্রধানত নগ্নতা, লিভ-টুগেদার, ফ্রি-সেক্স, অশ্লীলতা, মাদকাশক্তি ইত্যাদিরও মুখ্য প্রমোটার বটে।

ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে ইরান-ইরাক হয়ে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং চেচনিয়া-কাজাকস্তান থেকে সুদান-সেনেগাল পর্যন্ত ইসলামের যে নবজাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে (যার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও জায়নিষ্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে কার্যত; ক্রুসেডই ঘোষণা করেছেন) এবং স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর "ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস" শীর্ষক গ্রন্থে আগামীতে ইসলামই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান প্রতিপক্ষ হবে বলে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তাতে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও তাদের বিদেশী প্রভুদের মতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সর্বত্র তালেবান আলকায়েদার অলীক ভূত দেখে বেড়াচ্ছেন সম্ভবতঃ তাঁরা এই ভেবেও আতংকিত যে, ইসলামী ভাবধারার বিকাশ ঘটলে তাঁদের যথেচ্ছ যৌনাচার, অবৈধ অর্থসম্পদ, মাদক-নেশা ইত্যাদির সুযোগ উবে যাবে এবং তাঁদের জীবনটাও নিতান্তই রসহীন, বর্ণহীন ও বৈচিত্রহীন হয়ে পড়বে।

তবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য পরম আশার বিষয় হলো এই যে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই শুরু হয় মুসলমানদের মধ্যে ফিরকাহ, মাযহাব, পীরানা ইত্যাদিগত বিভক্তি ও হানাহানি; সেই থেকে এ যাবৎ দুনিয়ার মুসলমানরা কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে যে পারবে তারও এমন কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছেনা। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদেরও একই চিত্র। তদুপরি বর্তমান দুনিয়ার মৌলশক্তি চতুষ্টয় অর্থাৎ অর্থনীতি, সামরিক ক্ষমতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রবাহের ওপরও ইসলামপন্থীদের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকাতো দূরের কথা, এ সম্পর্কিত সুষ্ঠু ধারণাও তাঁদের আছে বলে মনে হয়না। ফলে ইসলামপন্থীরা বিশ্বের এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে দু'চারটা সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটালেও ইসলামবিরোধীদের উপরোক্ত চার শক্তির মোকাবেলায় তাদের বিজয়ী হওয়ার দৃশ্যতই আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য, অলৌকিক বা অপ্রত্যাশিত কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে বা ঘটনা ঘটে গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

স্বভাবতঃই, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা ইসলাম বিরোধীরাও এই পরিস্থিতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে খুবই তৎপর বটে।

আর আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিতো আসলে বিভিন্ন ঘরানা ও চিন্তাধারার লোকদের নিয়েই গঠিত। বিএনপিতে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠকারী ও তদানীন্তন চার নেতার অন্যতম শাজাহান সিরাজ যেমন

www.icsbook.info

রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন প্রথম সারির মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিত্ব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীও। বস্তুত এ রকম দলের মধ্যে একচরিত্রতা (Monolith) গড়ে ওঠা খুবই সুদূরপরাহত। তথ্য প্রবাহ ও মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কেও এখনো পর্যন্ত এই দলটির নেতানেত্রীদের কোন সুদৃঢ় উপলব্ধি আছে বলে মনে হয়না।

এমতাবস্থায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদাররা তাঁদের একতরফা প্রোপাগান্ডা ও কর্মকান্ড বাংলাদেশে আরো দীর্ঘ সময় যাবৎই কমবেশি চালিয়ে যেতে পারবেন বলেই মনে হয়। তাঁদের মূল বিপদ আসলে বিএনপি বা জামায়াত নয়, বরং জনগণ, বিশেষতঃ সচেতন জনগণ ও এলিট শ্রেণী, যারা জানেন সত্য কোনটি এবং অসত্য কোনটি। এরা গোয়েবলসীয় প্রচারণায় খুব কমই প্রভাবিত হন। এই নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরাই (Silent Majority) এক একটি নির্বাচনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে, তারাই সরকার গড়ে, সরকারের পতন ঘটায়। এদের হাত থেকে কারোরই নিস্কৃতি নেই।

প্রশ্নমালা : জবাব একদিন দিতেই হবে

মুক্তিযুদ্ধের সর্বস্বত্বের দাবীদার আওয়ামীলীগাররা, তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাতো সর্বদাই মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জনস্বার্থ, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ইত্যাদির ব্যাপারে খুবই সোচ্চার। এমতাবস্থায়, সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের যথার্থ ইতিহাসের স্বার্থে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে এবং জনগণ বিশেষতঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিভ্রান্তিমুক্তির স্বার্থে, তাঁরা কি অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহের জবাব দিয়ে জাতিকে বাধিত করবেন?

১. পাকিস্তান কায়েমের মূল হোতা মুসলিম লীগেরই একটি অংশ মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করে আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিটি উদ্যোক্তা ও নেতাই ছিলেন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের অ্যাক্টিব নেতা বা মুখর কর্মী (Activist)। এই নবগঠিত দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন অখন্ড আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। এর অপর শীর্ষ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন মুসলিম লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং অখন্ড বঙ্গের উক্ত দলীয় চিফ মিনিষ্টার। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমদও ছিলেন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর অ্যাকটিভিষ্ট। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর দলটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এবং ফলে দলটির

www.icsbook.info

নাম দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ। তাহলে আওয়ামী লীগ কি আসলে মুসলিম লীগেরই একটি প্রশাখা (Off-shoot) ও অপভ্রংশ নয়? একই ধারাবাহিকতারই অংশ নয়? একথাও কি সত্যি নয় যে, জিন্নাহ-লিয়াকত আলীদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেই পাকিস্তান হাসিল করেছিলেন?

২. একথা ঠিক, পাকিস্তান ছিলো একটি বিষম রাষ্ট্র। এর দুই অংশের মাঝখানে ছিলো বৈরী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জলবায়ু, নৃতত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা, খাদ্যাভাস অর্থনীতি কাঠামো, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি কোন দিক থেকেই কোন মিল ছিলোনা; একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত। পাকিস্তানের ক্ষমতাধর এলিটদের ১০০%ই ছিলো অবাঙ্গালী। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision-making) এর পর্যায়ে কোন বাঙালীর কোন প্রবেশাধিকারই ছিলোনা। আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনী সমূহের উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণপদে কোন বাঙালীতো ছিলোইনা, নিম্নতর পর্যায়েও বাঙালীর সংখ্যা ১০%-এর বেশি ছিলোনা। শিল্পব্যবসাসহ সমগ্র অর্থনীতি ছিলো অবাঙালীদের একচ্ছত্র কুক্ষিগত। পাকিস্তানের শীর্ষ ধনী ২২ পরিবারের একটি পরিবারও বাঙালী ছিলোনা। সকল সশস্ত্র বাহিনীরই হেড কোয়াটার্স ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। ইস্পাহানী ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তান ব্যবসারত বাদ বাকি সকল অবাঙালী কোম্পানিরও (যেমন, দাদা, দাউদ, আদমজী প্রমুখ) হেড অফিস ছিলো করাচীতে। পাকিস্তানের ফেডারেল বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের ৭৫%ই ব্যয়িত হতো পশ্চিম পকিস্তানে। অথচ, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। এমতাবস্থায়, পাকিস্তানের এই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক রাষ্ট্রভূক্ত থাকার কোন কারণ বা যুক্তিই ছিলোনা। ধর্মই যদি এক রাষ্ট্রের ভিত্তি হতো, তাহলে তো মধ্যপ্রাচ্যের সব রাষ্ট্র মিলে এক রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারতো, কারণ তাদের মধ্যেতো ধর্ম ছাড়াও নৃতত্ব, ভাষা ইত্যাদি আরও অনেক ব্যাপারেও গভীর সাযুজ্য আছে; ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আষ্ট্রেলিয়ার সব খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশ মিলে পারতো একটি এক রাষ্ট্র গঠন করতে, হিন্দু ভারতের সঙ্গে মিলে যেতে চাইতো হিন্দু নেপাল, এক হয়ে যেতো সমস্ত বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু তাতো কখনোই হয়নি। বরং খ্রিষ্টান হিটলার মুসোলিনীরাইতো যুদ্ধ করেছে খ্রিষ্টান চার্চিল রুজভেল্টদের বিরুদ্ধে। স্বভাবত:ই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানী শাসকশোষক গোষ্ঠির নির্মম উপনিবেশিক শাসন শোষণ নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী জনগোষ্ঠির মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই পটভূমিতে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু হাজির করেন ৬-দফা কর্মসূচী । বস্তুত: আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট রুহুল কুদ্দুস প্রমুখ কর্তৃক প্রণীত ৬-দফা কর্মসূচী ছিলো অবাঙালী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলা, ও সেনা কর্মকর্তাদের সংগে এঁটে উঠতে না পারা বাঙালী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলা, কর্মকর্তাদেরই নিরংকুশ স্বার্থের কর্মসূচী।

www.icsbook.info

এই কর্মসূচীর মধ্যে সাধারণ শোষিত নিপীড়িত জনগণের ত্রাণ বা মুক্তির ব্যাপারে একটি শব্দও ছিলোনা। একটি কথাও ছিলোনা শোষণ মুক্তি, সম্পদের সুষম বন্টন ইত্যাদির ব্যাপারে। এটাই কি, সত্যি নয় যে, ৬-দফা কর্মসূচী ছিলো বাঙালী আমলা-বুর্জোয়াদের একচ্ছত্র স্বার্থেরই কর্মসূচী? একথাও কি সত্যি নয় যে, ১৯৬৬ পরবর্তী স্বাধীকার আন্দোলনই ছিলো মূলতঃ এই দফা ভিত্তিক? আর একথাও কি অসত্য যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের গোটা আন্দোলনই ছিলো এই ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনেরই জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়?

৩. ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্র যদি কোনরূপ ধানাই পানাই ও চক্রান্ত না করে বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শৈখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহবান জানাতেন, তাহলে বঙ্গবন্ধুরা কি সঙ্গে সঙ্গেই সরকার গঠন করে ইসলামাবাদ গিয়ে বসতেন না? তাঁরা কি তাহলেও বলতেন, "না, আমরা সরকার গঠন করবোনা, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করবো"? ক্ষমতা না দেওয়ার পরও যেখানে তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ অনীহাসম্পন্ন, সেখানে আওয়ামীলীগকে পাকিস্তানের সরকার গঠন করতে দিলে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের কোন প্রশ্নই আদৌ আসতো কি? বস্তুতঃ নির্বাচনের পর থেকে ২৬ মার্চ (১৯৭১) হানাদারদের দানবীয় হামলার মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগিরা কি ইয়াহিয়া-ভূট্টোদের সংগে প্রাণপন আলোচনাই চালিয়ে যাননি একটা সমঝোতায় এসে ইসলামাবাদের সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে। ছাত্রদের একটি জঙ্গী অংশ চাপ সৃষ্টি করলে বঙ্গবন্ধু কি ৬ মার্চ (১৯৭১) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডকে একথা জানিয়ে দেননি যে, 'আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্ব শাসনেরই জন্য?" ২৩ মার্চ (১৯৭১) তারিখেও কি তিনি সাংবাদিকদের কাছে জোরের সঙ্গে বলেননি সে ইয়াহিয়া ভূট্টোর সঙ্গে তাঁর আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে? ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় অপারেশন সার্চলাইট শুরুর মাত্র ৩ ঘন্টা আগে, বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাসবভন থেকেই কি ঘোষণা করা হয়নি ২৭ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী? কয়েক ঘন্টা পর স্বাধীনতার ঘোষণার পরিকল্পনাই যদি থেকে থাকে, তাহলে ২৭ মার্চ তারিখে হরতাল ডাকার যৌক্তিকতা কি ছিলো? ২৫ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে দশটার সময়, অর্থাৎ হানাদারদের অপারেশন সর্চলাইট শুরুর মাত্র দেড় ঘন্টা আগেও বঙ্গবন্ধু কি তাঁর তদানীন্তন ঘনিষ্ঠতম সহযোগি ড. কামাল হোসেনের কাছে ব্যাগ্রতা প্রকাশ করেননি পরদিন (২৬ মার্চ) ইয়াহিয়া ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারে? এই ঘটনাপ্রবাহ কি প্রমাণ করে?

৪. আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বা অন্য কোন পর্যায়ের কোন কমিটিতে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মর্মে কখনোই কি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো?

www.icsbook.info

হয়নি। হয়ে থাকলে, এরূপ সিদ্ধান্তের কথা মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোন দলিল বা ইতিহাসে এযাবৎ উল্লেখ করা হয়নি কেন? আসলে সত্য কি এই নয় যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মর্মে আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়েই কখনোই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি? সত্য কি এ নয় যে, বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের মূলধারা অখন্ড পাকিস্তানের সরকার গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬ দফা-ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের বাইরে আর কোন কিছুই কখনো ভাবেননি? এটাও কি সত্য নয় যে, ছাত্রলীগের স্বাধীনতাকামী অংশটি চাপ সৃষ্টি করলে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগাররা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং ২৮/২/৭১ তারিখে তাঁরা এই চাপের ব্যাপারটি পাকিস্তানী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে জানিয়েও দিয়েছিলেন, যাতে রাও ফরমান আলী এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন?

৫. বস্তুতঃ উক্ত ২৮/২/৭১ তারিখে ঢাকাস্থ গভর্ণমেন্ট হাউসে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেছিলেন, "আমার অবস্থা হলো-দু'পাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে। নয় আমার দলের চরম পন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসবো" (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, মেজর সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৫৬)। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া। আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য।" (পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিট লোসাক, পৃষ্ঠা ৭১-৭২)। বঙ্গবন্ধুর এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া কি?

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি পূর্ব পরিকল্পিতই হয়ে থাকে, স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি, মুদ্রানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, বাণিজ্যনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির রূপ কি হবে, সে ব্যাপারে আদৌ কোন নীলনক্সা প্রণয়ন করা হয়েছিল কি? হয়নি। বস্তুতঃ ১৯৭০ সালের ৬ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার ছাড়া আওয়ামী লীগের অপর কোন সংজ্ঞায়িত সামাজিক বা অর্থনৈতিক কর্মসূচীই ছিল না (বাংলাদেশ; শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, (পৃষ্ঠা-১৮)। আসলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথা বলতে আদৌ রাজী ছিলেন না। সিরাজুল আলম খান ও তাঁর সহযোগিরা বঙ্গবন্ধুর ওপর এ ব্যাপারে চাপ অব্যাহত রাখলে, তিনি ৬ মার্চ দিবাগত রাত ২ টার সময় পুণরায় তৎকালীন জি. ও. সি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার কাছে বিশেষ দূত মারফত এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে চাপের মধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার শক্তি তাঁর নেই। অতএব

www.icsbook.info

তাঁকে যেন সেই রাত্রেই সেনাবাহিনীর হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয় (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, মেজর সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৬৪) জি.ও.সি. বঙ্গবন্ধুর এই আবেদনের সাড়া না দেওয়ায় অনন্যোপায় বঙ্গবন্ধুকে পরদিন (৭ মার্চ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে উগ্রপন্থী তরুণদের শান্ত করার জন্য এটুকু বলতেই হয় যে, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এটাই কি প্রকৃত সত্য নয়? একথাও কি সত্য নয় যে, ৭ নভেম্বরের এই ঘোষণার আগে বা পরে বঙ্গবন্ধু আর কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি?

৭. ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলেই যদি বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সমবেত শতশত দেশীবিদেশী সাংবাদিকের সামনে কেন ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী কর্মসূচী হলো ২৭ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল? এর অর্থ কি? কেন রাত সাড়ে দশটার সময় বঙ্গবন্ধু ড. কামাল হোসেনের কাছে ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন পরদিন (২৬ মার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংগে বৈঠকে বসার জন্য (ড. কামাল হোসেন লিখিত প্রবন্ধ, দি ডেইলী নিউজ, ২৬ মার্চ, ১৯৮৭ সংখ্যা) এই ব্যাগ্রতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, মাত্র ৬০ মিনিট পর কি ঘটতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কোন ধারণাই ছিল না? তিনি আদৌ জানতেন না যে, ক্র্যাক ডাউনের নির্দেশ দিয়ে সেদিন সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদ পাড়ি জমিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুই যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি এই কালরাতে বাড়ীতে বসে থাকলেন কি যুক্তিতে? পৃথিবীর কোন দেশের কোনা কালের কোন বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের কোন নেতা কি এইভাবে এইরূপ খোঁড়া যুক্তিতে বীভৎস শত্রুর হাতে ধরা দেওয়ার জন্য আপন শোয়ার ঘরে স্যুটকেস সাজিয়ে বসেছিলেন? স্বাধীনতা ঘোষণার ফলশ্রুতি কি হতে পারে, এ ব্যাপারে তাহলে কি তাঁর কোন ধারণাই ছিল না? কেন হানাদার ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বঙ্গবন্ধুর দলের নেতারা সব পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং উদভ্রান্তের মতো যে যখন পারলেন, যেভাবে পারলেন, যে পথে পারলেন–সে সময়ে সেভাবে সে পথে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ভারতে গিয়ে উঠলেন। এর বিজয় দিবসে বেগম জোহরা তাজউদ্দিনের লিখিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং তাজউদ্দিন আহমদও অন্যান্য সহকর্মী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন রকমে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। কেন? এই কি পরিকল্পিত মুক্তিযুদ্ধের নমুনা? কেন ইন্দিরা গান্ধী তিক্ত ক্ষোভের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে বলেছিলেন, "ভূ-ভারতে কে কবে শুনেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রুপক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়? আপনারা প্রথমে বলেছিলেন তিনি (বঙ্গবন্ধু) ২৫ মার্চ রাত্রেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এখন দেখা গেল আপনাদের

www.icsbook.info

সেকথা ঠিক নয়। এটা যুদ্ধের কোন ধরনের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন" (ঢাকা-আগরতরা-মুজিবনগর, এম এ, মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৬৪)? কেন আওয়ামী লীগের অতি ঘনিষ্ঠ রাজনীতি-কূটনীতিবিদ কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর "স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় ও অতঃপর" গ্রন্থে লিখলেন, "আওয়ামী লীগের নেতারা এমনিভাবে দেশত্যাগ করায় এটাই পরিস্কার হয়েছিল যে, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শেখ সাহেব বা আওয়ামী লীগের কোন প্রস্তুতি বা পরিকল্পনাই ছিল না?" (পৃষ্ঠা-১২১) বাস্তব সত্য কি এই নয় যে, বঙ্গবন্ধুর বা তাঁর দলের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কোনো পরিকল্পনাই ছিল না এবং কোনো ধারণাই ছিল না ইয়াহিয়া খাঁর 'অপারেশন সার্চ লাইট' সম্পর্কে?

৮. ১৯৭১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিস্থ সেনাবাহিনী সদর দফতরে জেনারেল আবদুল হামিদ, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল টিক্কা খান, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান এস এ, সউদ প্রমুখের উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর কঠোর হামলা চালানো হবে। কৌশল হিসাবে ওরা সাব্যস্ত করে যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীদের আলোচনায় ব্যস্ত রেখে, সৈন্য ডেপ্লয়মেন্ট ও ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। সেই অনুযায়ী যুদ্ধজাহাজ 'সোয়াত' প্রভৃতিকে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়। আপনারা এসব খবর আদৌ জানতেন কি? জানলে এর প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? যে কোন যুদ্ধ শুরুরই অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য পূর্ব কাজ হলো যুদ্ধের ষ্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিকস, ষ্ট্রাইকিং ফোর্স, সাপোর্টিং ফোর্স, কমান্ড ষ্ট্রাকচার, চেইন অব কমান্ড এবং গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল, পশ্চাৎভূমি ইত্যাদি নির্ধারণ করা। এগুলোকেই বলা হয় পরিকল্পনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দল কি আদৌ কোন ষ্ট্র্যাটেজি বা কমান্ড ষ্ট্রাকচার নির্ধারণ করেছিলেন? কখনোই করেননি। এসবের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পরিকল্পিত বলে দাবী করা কি নিতান্তই অর্বাচীন ছেলেমানুষী নয়?

৯. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন যদি সত্যিই আপনাদের পূর্বপরিকল্পিত হয়েই থাকে, তাহলে তো পাকিস্তানী হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ুক আর নাইই পড়ুক, আপনারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতেনই। প্রশ্ন হলো, হানাদাররা ঝাঁপিয়ে না পড়লে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করবেন বলে আপনারা সাব্যস্ত করেছিলেন? দলিল প্রমাণসহ তা হাজির করতে পারবেন কি?

১০. আপনারা বলছেন বঙ্গবন্ধুই ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাত্রি সাড়ে ১০ টার পর। কিন্তু, কিভাবে? প্রথমে আপনারা বলতেন, অয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা পাঠিয়ে ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙরকৃত

www.icsbook.info

কোন এক জাহাজের অয়্যারলেস রিসিভিং সেটে, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওই সময় কি অয়্যারলেস ব্যবস্থা আদৌ চালু ছিলো? ছিলো না। বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙরকৃত জাহাজের অয়্যারলেস কোডইবা জানলেন কি করে? জবাব নেই। তখন তো চট্টগ্রাম বন্দর পুরোপুরি হানাদারদের দখলে। পাকিস্তানী যুদ্ধজাহাজ সোয়াত তখন আঘাত হানার পূর্ব পজিশনে। এই অবস্থায় বন্দরের কোন জাহাজে ম্যাসেজ পাঠানো কি আদৌ সম্ভবপর ছিলো? ছিলোনা। পরে অবশ্য জহুর আহমদ চৌধুরীকে বাদ দিয়ে কারো মতে এম.এ. হান্নান এবং করো মতে জনৈক আনোয়ারের কাছে অয়্যারলেসে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠানো হয়েছিলো বলে প্রচারণা শুরু হয়। কিন্তু তাইই বা কিভাবে সম্ভব? হানাদাররা যখন রাত ১২ টার দিকে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায়, তখন তারা কি সেখানে কোন ওয়্যালেস প্রেরক যন্ত্র পেয়েছিলো? পায়নি। তাহলে বঙ্গবন্ধু অয়্যারলেস সংযোগ করলেন কিভাবে? কোত্থেকে? পুরো অয়্যারলেস সিষ্টেম যেখানে বদ্ধ, সেখানে তিনি নেটওয়ার্কইবা পেলেন কিভাবে? সবচেয়ে বড়োকথা, আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা তাজউদ্দিন আহম্মদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি প্রমুখ সবাই তখন ঢাকায়। তাদের কাউকে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা না জানিয়ে বঙ্গবন্ধু সেটা সুদূর চট্টগ্রামের জেলা পর্যায়ের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী, হান্নান বা অখ্যাত আনোয়ারের কাছে পাঠাতে গেলেন কোন যুক্তিতে? কি এর রহস্য? এমন কি রাত সাড়ে ১০ টার সময়তো তাঁর সঙ্গে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ড. কামাল হোসেনেরই দেখা হয়েছিলো। অথচ, বঙ্গবন্ধু ড. কামালকেও স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যাপারে কিছুই না বলে, পরদিন ইয়াহিয়া ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন কেন?

আরো উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাত্রির ঘটনাবলীর একটি বিশদ বিবরণ দেন, যা ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়। বেগম মুজিবও ওই রাত্রে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে কোনই উল্লেখ করেননি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর যে বর্ণনা দেন তাতেও বঙ্গবন্ধু ওই রাত্রে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বা চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন বলে কোনই উল্লেখ নেই (আমার ফাঁসি চাই, মতিউর রহমান রেন্টু, পৃ: ৯৮-১০১)। সর্বোপরি, স্বয়ং বঙ্গবন্ধুও তাঁর জীবনকালে কখনোই কি দাবী করেছিলেন যে, তিনি ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে কোনরূপ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন? আসলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বকৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর ওপর আরোপ করা এবং তা আওয়ামী লীগের ঘরে মওজুদ রাখার স্বার্থে এই স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটি কি একটি নিছক গল্প বা স্থূল চালাকি (Hoax) মাত্র নয়? এরকম গল্প কি কখনোই বাস্তবতা ও ইতিহাসের ধোপে টেকে?

www.icsbook.info

১১. এযাবৎ পৃথিবীর অসংখ্য দেশ মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে উপনিবেশিক শোষণ বা দখলদারীর কবল থেকে মুক্তি অর্জন করেছে। কিন্তু, স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পুরুষ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার বদলে যুদ্ধ শুরুর আগেই একদম স্বেচ্ছায় উপনিবেশবাদী শক্তি বা দখলদারের হাতে ধরা দিয়ে বসেছেন বা ওরা ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজ বাড়ীতে নিশ্চিন্তে বসে থেকেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে এরকম একটিমাত্র নজীরও কি কেউ কোথাও দেখাতে পারবেন? জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে লেলিন, মাওসেতুং, হো চি মিন, কিম ইল স্যুং, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, ড. শোয়েকার্নো, আবু বকর তাফাওয়া বেলওয়া, বেনবেল্লা, প্যাট্রিস লুমুম্বা, ইমাম খোমিনী, জোখার দুদায়েভ সহ দুনিয়ার কোন কালের কোন দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের কোন নায়ক কখনোই প্রতিপক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেননি। এটি অসম্ভব, অবাস্তব, অকল্পনীয়। একটা আক্রমনোদ্যত হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা এক অতি ভয়ংকর ব্যাপার। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন একথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তিনি কোন ভরসায় নিজ বাড়ীতে বসেছিলেন? তিনি কোন যুক্তিতে আশা করলেন যে, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানীরা তাঁকে হত্যা করবেনা? আসলে কি ব্যাপারটা এ নয় যে, বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া ভূট্টোদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, ড. কামাল হোসেনকে সেজন্য অনুরোধও করেছিলেন? স্বাধীনতা ঘোষণাতো দূরের কথা, এর বিন্দুমাত্র পক্ষেও তিনি কখনো ছিলেননা এবং এজন্যই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার বদলে সেই পাকিস্তানেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন, যেই পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁরও বিরাট অবদান ছিলো এবং যে পাকিস্তানের অখন্ডতাই ছিলো তাঁর একান্ত কাম্য (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বক্তব্য দ্রষ্টব্য)? তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে, যেহেতু ফরমান আলী সবারই খুব ভালো করেই জানা ছিলো, সেহেতু তারা তাঁকে কখনোই হত্যা বা নির্যাতন করবে না। আসলে এই আত্মবিশ্বাস থেকেই কি তিনি বাড়ীতে বসেছিলেন না? এবং বাস্তবেও কি ঠিক তাই ঘটেনি? অনেকে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে বসে থাকা ও হানাদারদের হাতে ধরা দেওয়াকে জাষ্টিফাই করার জন্য এই যুক্তি হাজির করেন যে, বঙ্গবন্ধুকে না পেলে হানাদাররা বাঙ্গালীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতো, তাই বাঙালী হত্যা কমানোর জন্যই তিনি এভাবে ধরা দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কের কাজ কি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া, নাকি যুদ্ধ কিভাবে চলবে তার কোন তোয়াক্কা না করে এ ধরনের যুক্তিতে প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দেওয়া? যাই হোক, এই যুক্তি যদি আদৌ সঠিক হতো, তাহলেতো বঙ্গবন্ধুকে ধরার পর হানাদারদের আর বাঙালী হত্যা না করারই কথা ছিলো। কিন্তু তারা কি বাঙালী হত্যায় কখনোই কোনই কার্পণ্য করেছিলো? ইয়াহিয়া-নিয়াজি কি পাকসৈন্যদের এমন কোন নির্দেশ দিয়েছিলো যে, আমরা

www.icsbook.info

বঙ্গবন্ধুকে ধরেছি, অতএব তোমরা বাঙালী হত্যা বন্ধ করো কিংবা অল্প অল্প হত্যা করো? বরং, বাস্তবতা কি এ নয় যে, বঙ্গবন্ধুকে ধরার রাতেই এই ঢাকা শহরেই হাজার হাজার বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছিল, হত্যা করা হয়েছিলো ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে, রিক্সাওয়ালা ভিক্ষুক কাউকেই সেরাত্রে রেহাই দেওয়া হয়নি? আপনারাইতো বলছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হানাদাররা ৩০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করেছিলো, ধর্ষণ করেছিলো কয়েক লক্ষ মা বোনকে। তাহলে বঙ্গবন্ধু ধরা দিয়ে লাভটা হলো কি? হানাদাররা কি কখনোই পাইকারী বাঙালী হত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, অগ্নি সংযোগ, লূটপাট ইত্যাদি থেকে এক রত্তিও বিরত ছিলো? ছিলো না। আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অসমর্থন ও অনীহাজনিত কারণেই বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে আড়াল ও জাষ্টিফাই করার উদ্দেশ্যেই কি "বঙ্গবন্ধু ধরা দিলে হানাদাররা বাঙালী মারবেনা" এই উদ্ভট, মিথ্যা, অযৌক্তিক, অবাস্তব তত্ত্বের অবতারণা নয়?

১২. ১৯৪৭ সাল পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনই ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকে স্বৈরাচারের অবসান কিংবা প্রাদেশিক দাবী আদায়ের আন্দোলন। ৬ দফাও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রুহুল কুদ্দুস ৬ দফা প্রণয়ন করেন। (আইয়ুব খান কর্তৃক পদচ্যুত আমলা রুহুল কুদ্দুসকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব নিয়োগ করা হয়, কিন্তু বঙ্গবন্ধুই আবার তাঁকে দূর্নীতির দায়ে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন) যাই হোক, এই ৬ দফাই ছিল বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ততম আদর্শ, তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের ম্যাগনাকাটা। এই ৬-দফার ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এই ৬ দফার ওপরই ছিলেন অবিচল। কিন্তু ৬ দফার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় তো দূরের কথা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ কিংবা দরিদ্র জনগণের শোষণ ও দারিদ্র মুক্তির ব্যাপারেও একটি শব্দমাত্র ছিল না। আগেই বলা- হয়েছে, ৬-দফা ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই অবাঙ্গালী পূঁজিপতি ও আমলাদের সংগে এঁটে-উঠতে-না পারা পূর্ব পাকিস্তানী উঠতি পূঁজিপতি ও আমলাদেরই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দলিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে যিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন-বাংলাদেশের চিন্তাভাবনা করেন, তাঁর নাম বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম। তৎকালীন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হিসাবে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সংবিধানে (১৯৬২) দস্তখত করতে অস্বীকার করার দরুণ আইয়ুব খান বিচারপতি ইব্রাহীমকে বরখাস্ত করেন। এই বিচারপতি ইব্রাহীমেরই উদ্যোগে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই তরুণদের যে একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছিল, তারই অন্যতম সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খাঁন, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ও অন্যান্যরা। এই লেখকও। এরপর সশস্ত্র উপায়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রথম উল্লেখযোগ্য

www.icsbook.info

উদ্যোগ গ্রহণ করেন পাকিস্তান নেভীর কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তাঁর দুঃসাহসী সহযোদ্ধারা। চট্টগ্রামের ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী ও ডাঃ সৈয়দুর রহমান, উভয়েই আওয়ামী লীগ সদস্য) এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই উদ্যোগ ফাঁস হয়ে গেলে শুরু হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার প্রথম দিকে আসামীদের তালিকায় বঙ্গবন্ধুর নামই ছিলোনা, কিন্তু পরবর্তীতে আইয়ুবশাহী তাকেও অনাহুত ফাঁসিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ২৮ জানুয়ারি সামরিক ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দানকালে স্পষ্টভাষায় বলেন, "এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এক্স কর্পোরাল আমির হোসেন, এল, এস, সুলতান উদ্দিন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থলে, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কখনো দেখি নাই। ইহা অসম্ভব যে, একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী, একজন সাধারণ এল, এম, এফ ডাক্তার সৈয়দুর রহমানকে আমি কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে পারি। ..... আমি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, ইহা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কোনদিনই আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায় বিচার চাহিয়াছিলাম ..... আমি কখনো এমন কিছু করি নাই বা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে স্থল, নেভী বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না" (বঙ্গবন্ধুঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আবীর আহাদ, পৃষ্ঠা-২৮-৫৯)। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মামলার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর সামনে এক মহানায়ক হিসাবে আভির্ভূত হন এবং আইয়ুব শাহীর মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। রাজনীতির মঞ্চ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু, এইসব উদ্যোগকে স্বীকার করলে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর কৃতিত্বের সিংহভাগই বিচারপতি ইব্রাহীম, কমান্ডার মোয়াজ্জেম, মাওলানা ভাসানী প্রমুখকে দিয়ে দিতে হয় বিধায় আপনারা এব্যাপারে কোনদিনই উচ্চবাচ্য করেননি, আজও করেন না। আপনারা যাঁরা স্বাধীনতার 'সত্যিকার' ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা কি ঘুর্ণাক্ষরেও এঁদের নাম উচ্চারণ করেন? শহীদ মোয়াজ্জেমের পরিবার-পরিজনের সামান্য খবরটুকু নেওয়ার গরজও কি কোনদিন অনুভব করেন? এইই কি আপনাদের যথার্থ ইতিহাস নিষ্ঠার প্রমাণ? সততার প্রমাণ?

১৩. যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ পূর্বপরিকল্পিত ছিল না, সেহেতু এব্যাপারে ভারতের সঙ্গে তেমন কোন পূর্ব ব্যবস্থাও ছিল না। বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র তাঁরই

www.icsbook.info

তদানীন্তন দলীয় জাতীয়-সংসদ সদস্য, কোলকাতার ২১ নং রাজেন্দ্র রোডে বসবাসরত চিত্তরঞ্জন সুতার-এর সঙ্গেই। বস্তুতঃ তখন দুই বৈরী শক্তি চীন ও পাকিস্তানের চাপে ভারতের রীতিমত নাভিশ্বাস উঠছিল। এমতাবস্থায়, এক বৈরী শক্তিকে খন্ডিত-হীনবল করার অচিন্তনীয় সুযোগ যখন 'ভগবানের আশীর্বাদ'-এর মতো এসেই গেল, ভারত স্বভাবতঃই সে সুযোগ লুফে নিল। ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রি জগজীবন রাম ক্র্যাক ডাউনের পর দ্বিধাগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, "ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুযোগকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না" (দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং, পৃষ্ঠা-১৮)। সেদিন ভারত যদি তার জন্মশত্রু পাকিস্থানের খন্ডন ও বিপর্যয় না চাইতো এবং আপন ভূমি ত্যাগী বাঙালীদের তাৎক্ষণিক আশ্রয়, অস্ত্র ও টেনিং না দিত, তাহলে এই রকম প্রস্তুতিহীনতা, প্রথম আঘাতেই নেতা কর্মীদের পরস্পর ছিটকে পড়া, কোন চেইন অব কমান্ড বা কমান্ড ষ্ট্রাকচার না থাকা এবং সর্বোপরি মূলনেতা বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে অবস্থান ইত্যাদির বাস্তব পরিণতি কি দাঁড়াতো? ভারতের আশ্রয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং না পেলে আপনারা কিভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের ঠেকাতেন? হানাদারদের ক্র্যাকডাইনের পর আপনাদের উর্ধশ্বাস পলায়নপর হাল অবস্থা কি প্রমাণ করে?

১৪. একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে, বঙ্গবন্ধু যখন পশ্চিম পাকিস্তানে, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনবতর ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল, "বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে আছেন; বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন" ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া-ভূট্টোচক্র অনায়াসেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, এর সমস্ত দায়দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে পারতো। বঙ্গবন্ধুকে খতম করে তারা বলতে পারতো, মুক্তিযোদ্ধারাতো দাবী করছে শেখ মুজিব তাদেরই সঙ্গে আছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিনা; যা জানার তারাই জানে। ইয়াহিয়া ভূট্টোচক্র যদি বাস্তবিকই মনে করতো যে বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক-রূপকার এবং পাকিস্তান-ভাঙ্গার মূল হোতা, তাহলে তারা কি এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করে ছাড়তো? কেউ কি কখনো এমন সুযোগ ছাড়ে? যখন পাকিস্তানি হানাদাররা মুটে মুজুর রিক্সাওয়ালা নির্বিশেষে যে কোন বাঙ্গালীকে দেখামাত্রই হত্যা করেছিল, ঠিক তখনই তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ধানমন্ডির অপর একটি বাড়ীতে সরিয়ে নিয়ে পরম যত্নে-সমাদরে রাখলো কেন? হানাদারেরা তাঁদের গায়ে একটা ফুলের টোকাও দিল না কেন? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওই সময় সন্তান সম্ভবা হলে কেন হানাদাররা তাঁকে সিএমএইচে নিয়ে গিয়ে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাঁর সন্তান জয়কে প্রসব করালো? কেন শেখ হাসিনা ছিলেন পাকিস্তানী হানাদারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ (আমার ফাঁসি চাই, পৃ: ৯৯-১১০)। কি এসবের রহস্য?

www.icsbook.info

১৫. একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্য, কোনো এম.এন. এ, কোনো এম.সি এ, এমনকি কোনো জেল কমিটির কোনো সভাপতি সাধারণ সম্পাদকও মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেননি (মুক্তিযুদ্ধের সুচনাতেই উক্ত দলীয় যশোরের এম. এন. এ মসিউর রহমানই শুধু প্রাণ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটাও হানাদারদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নয়)। শহীদদের একমাত্র পরিচয়- সন্ধানী শিমুল মোস্তফা তাঁর দীর্ঘ গবেষণা ও সরজমিনে তদন্ত থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ: ছাত্র ৮%, কৃষক ২০%, শ্রমিক ১৪%, চাকুরিজীবী ১৩%, ব্যবসায়ী ১০%, গৃহবধূ ১৪%, শিক্ষক ইত্যাদি ৩০%, অন্যান্য ১৭% (একাত্তুরের বধ্যভূমির সন্ধানে, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা-৯৩, পৃষ্ঠা-২১)। লক্ষ্যনীয় এখানে শহীদ রাজনীতিবিদদের সংখ্যা শূন্য। এর কারণ কি? এঁদের সকলেই কি এমন অতুলনীয় অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন যে হানাদার বাহিনীর গুলি তাঁদের শরীরে লেগে লেগে ঠিকরে পড়ে গেছে? নাকি আসলে এঁরা যুদ্ধের ময়দানের ধারে কাছেও কখনো যায়নি? মোট কথা, বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত তরুণ-যুবক-পৌঢ়রা যখন হানাদারদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসের এক অসম সাহসী যুদ্ধে লিপ্ত ও অকাতরে প্রাণদান রত, ঠিক তখনই এসমস্ত নেতা এম.এন.এ.এম.পি এরা প্রকৃত যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক দূরে, কোলকাতা-আগরতলা-দেরাদুন-দিল্লীতে বসে জীবন যৌবনকে উপভোগ করেছিলেন, এটাই কি কঠোর সত্যি নয়?

১৬. বস্তুতঃ ভারত তার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল বন্ধ করে দিলে, চট্টগ্রাম বন্দর অচল হয়ে গেলে এবং আভ্যন্তরীণ সড়ক ও রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পাক হানাদারদের সাপ্লাই লাইন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। পাক সৈন্যেরা বেপরোয়া ধর্ষণ ও লুটপাটে লিপ্ত হওয়ায় তাদের জঙ্গী শক্তি ও মনোবলও নষ্ট হয়ে যায়। সর্বোপরি, তাদের ও তাদের সীমাহীন বর্বরতা-অত্যাচার-নিপীড়নের ফলে কিছুসংখ্যক রাজাকার-আলবদর-আলশামস ব্যতীত বাংলাদেশের সমস্ত আবালবৃদ্ধবনিতাই চলে যায় হানাদারদের বিরুদ্ধে।

বস্তুতঃ দু:শ্চরিত্র বর্বর পাক হানাদাররা তখন লড়ছিলো একটা গোটা জাতির বিরুদ্ধে। আর এটাতো সকলেরই জানা যে, একটা জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর কোন শক্তিই কোনদিন বিজয়ী হতে পারে না, যেমন, মার্কিনীরা পারেনি ভিয়েতনামে কিংবা রুশরা পারেনি আফগানিস্তানে। একাত্তুরের নভেম্বরের দিকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানীদের পতন অনিবার্য ও সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই পরিস্থিতিতে আয়েশী নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদার দলটির নেতারা দিল্লীতে ছুটে যান এবং ভারতের সঙ্গে তড়িঘড়ি করে এক ৭-দফা চুক্তি সম্পাদন করেন, যার

www.icsbook.info

ফলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব ভারতীয় সেনা বাহিনীর হাতে চলে যায় এবং জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাই হয়ে যান মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র সর্বাধিনায়ক। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে নেতৃত্ব কুক্ষিগত রাখার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা এভাবে ভারতীয়দের হাতে যুদ্ধের ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতির সমস্ত কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন, এটাই কি বাস্তব সত্যি নয়? এটাও কি সত্যি নয় যে, নেতাদের এই ভূমিকার ফলে শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয়, বাংলাদেশের ওপরই ভারতীয় কর্তৃত্বের গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিলো?

১৭. একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ যদি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানী জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলো কেন? কেন মুক্তি বাহিনীর চিফ অব ষ্টাফ এম, এ, জি, ওসমানী বা অন্য কোন বাঙালী কর্তৃপক্ষের কাছে করলোনা? কেন আত্মসপর্ণনের দলিলে বাংলাদেশের কাউকে সাক্ষী হিসাবেও রাখা হলো না? কেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিদের কোলকাতা থেকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া হলো বিজয়ের এক সপ্তাহ পর,-২২ ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে? এইসব ঘটনা কি মুক্তিযুদ্ধের ওপর বঙ্গবন্ধুর দলের কর্তৃত্ব প্রমাণ করে? প্রমাণ করে আপনাদের মুখ্য ভূমিকা? আসলে এসবই কি দিল্লিতে সম্পাদিত বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ৭-দফা চুক্তির ফলাফল নয়; যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গেই সৈয়দ নজরুল মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন? (চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে প্রদত্ত)।

১৮. যেইই করুক, যে কারণেই করুক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা নিঃসন্দেহে একটি অতি জঘন্য কাজ। অবশ্য, যে কোন হত্যাই অতীব জঘন্য ও ঘৃণার্হ। এটা মেনে নিয়েই এবং এই শহীদদের প্রতি পূর্ন শ্রদ্ধা রেখেই জানতে ইচ্ছে করে, ১৯৭১ সালে, বিশেষতঃ ১৪ ডিসেম্বর তারিখে যেসব বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা কি মুক্তিযুদ্ধে আদৌ অংশগ্রহণ করেছিলেন? মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের কার কি অবদান ছিল? নাকি, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে আদৌ অংশগ্রহণ করেননি? বরং এই ঢাকা শহরেরই নিজ নিজ বাসাবাড়ীতেই পরম নিশ্চিন্তমনে বসেছিলেন? মুনীর চৌধুরী (যিনি বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য আইয়ুব খানের আমলে গঠিত ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশান বা বি, এন, আর-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) সহ এসব বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছিলেন না? স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে যোগসাজস না থাকলে এইসব বুদ্ধিজীবীরা ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরেরই নিজ নিজ বাসা বাড়ীতে বসবাস করছিলেন কিভাবে? কোন ভরসায়? পরাজয়ের মুহূর্তে এইসব বুদ্ধিজীবীরা প্রাণদিয়ে ন্যাক্কারজনক হানাদার নির্ভরতারই প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছিলেন, এটাই কি তিক্ত অথচ

www.icsbook.info

মর্মান্তিক সত্যি নয়? আজকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মহা ধারক বাহক বুদ্ধিজীবীরা (কতিপয় ব্যতিক্রম পদে) কেন ১৯৭১-এ এই ঢাকা শহরেই বসে বসে চাকরি, অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি চালিয়ে গিয়েছিলেন?

১৯. একাত্তুরের ১৪ ডিসেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে কি রাজাকার আলবদরদের আদৌ কোন কার্যকরিতা ছিল? আসলে কারা হত্যা করেছিল স্ব-স্ব গৃহে অবস্থানকারী এসব বুদ্ধিজীবীদের? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠতম সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন ষ্টোনহাউজ এই সময়ে স্বশরীরে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১-এর ২১ ডিসেম্বর আকাশবানী, কোলকাতা কেন্দ্রের প্রদত্ত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জন ষ্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানী সৈন্যেরাই যে জড়িত তাঁর কাছে তার প্রমাণ আছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে জেনারেল পদমর্যাদার দশজন পাকিস্তানী অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে এব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যও তিনি জোর দাবী উত্থাপন করেন। কেন এই তদন্ত অনুষ্ঠান করা হয়নি? কেন এবং কারা সংশ্লিষ্ট এই ১০ সামরিক অফিসারকে বিমানযোগে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল? জন ষ্টোনহাউজ তো আপনাদেরই লোক। তার বক্তব্য ও দাবী কি মিথ্যে ছিল? নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবার পরিজনের চাপে পরবর্তীকালে যে তদন্ত কমিশন (দেশীয়) গঠন করা হয়েছিল, তার রিপোর্টইবা প্রকাশ করা হলো না কেন? তখনতো বঙ্গবন্ধুর দলই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তখন এই রিপোর্ট ধামাচাপা দিল কারা? কি উদ্দেশ্যে? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে, সেই ভয়ে? রাজাকার-আলবদররা যদি এর জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে তখনই তাদের বিচার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো না কেন? যুদ্ধের পরপরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং শাস্তিইতো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কেন, কোন্ সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে রাখা হলো? এই ব্যর্থতা কাদের? কারা এর জন্য দায়ী?

২০. জহির রায়হান নিখোঁজ হন ৩০ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে। কোলকাতায় অবস্থানকালীন সময়ে, তিনি নাকি স্বাধীনতার একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদার দলটির অনেক নেতা এম এন এ, এম সি এ-দের তাস-জুয়া-মদ্যপান নারী সম্ভোগ অধ্যুষিত জীবনধারার প্রামাণ্য চিত্র তুলে এনেছিলেন। এই জহির রায়হানকে কারা হত্যা করলো? তখনতো বাংলাদেশ রাজাকার আলবদরের নাম গন্ধও ছিল না। তাকে হত্যা করার মধ্যে কাদের স্বার্থ নিহিত ছিল? তাঁর তোলা ছবির রীলগুলোইবা গেল কোথায়? সেগুলো কারা লুকালো? কেন লুকালো?

www.icsbook.info

২১. আপনাদের কি স্মরণ আছে যে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বর পরপরই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এক এক জন অফিসারকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল। এই সময়ের মধ্যে পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ওদের লুট করা সোনা-দানা, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যুদ্ধের ৯ মাসে জমেওঠা বিশাল পরিমাণ আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রী, ইলেক্ট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি-সহ অন্ততঃ ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের মতেই এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে লুটে নেওয়া সম্পদের পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার এর কম হবে না (কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "অনীক" ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৯১)। এছাড়াও প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী ভারতে পাচার করা হয়েছিল (জনতার মুখপত্র, ডিসেম্বর-১,১৯৭৫)। এই লুটপাট কি আপনারা আনন্দ ও ভক্তিবিগলিত চিত্তেই অবলোকন করেননি? এখনো পর্যন্ত কি আপনারা এই লুণ্ঠনের স্বপক্ষে স্তুতি গাইছেন না? এই লণ্ঠনে বাধা দেওয়ার অপরাধে, বাংলাদেশের সম্পদ বাংলাদেশে রাখতে চাওয়ার অপরাধে আপনারাই কি নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর, এম, এ জলিলকে কারারুদ্ধ করেননি? অন্য সকল সেক্টর কমান্ডার ও ফোর্স অধিনায়কদের 'বীরোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করলেও, ওই অপরাধেই আপনারা কি মেজর জলিলকে সর্বপ্রকার খেতাব ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি? এই ঘটনাবলী কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের সর্বস্বত্বের দাবীদাররা ভারতীয় লুটপাটের একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রত্যক্ষ দোসর ছিলেন এবং আজো আছেন? আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক তো বলেছেন, মেজর জলিল রাজাকার ছিলেন। তাহলে ৯ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা কি একজন রাজাকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো?

২২. মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং মেজর জেনারেল লছমন সিং ও মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান-সহ বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সামরিক অফিসার ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীই পাকিস্তানী হানাদারদের পরাজিত করে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা 'উপহার' দিয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থেই বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে কঠোর ও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ মুলতঃ ভারতীয় সৈন্যদের কুলি ও পথপ্রদর্শক হিসাবেই অবদান রেখেছিল। কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ আসলে ভারতীয়দেরই অবদান, "তবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নামে কিছু 'গপ্পো' চালু আছে"। ১৩৯৯ সালের শারদীয় সংখ্যা "দেশ" এ বিখ্যাত সাংবাদিক নীরদ সি. চৌধুরী বাংলাদেশকে "তথাকথিত বাংলাদেশ" বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয়

www.icsbook.info

জেনারেল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এসব দাবী ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপনারা, স্বাধীনতা-প্রগতি-ধর্মনিরপেক্ষতার একচ্ছত্র দাবীদাররা একটি শব্দও কখনো উচ্চারণ করেননি। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আপনারাও বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসলে ভারতীয়দেরই অবদান? এজন্যই কি আনপাদের অন্ধ ভারতভক্তি?

২৩. পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠী ২৪ বছর যাবৎ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ওপর যে উপনিবেশিক শোষণ-বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছিলো, তারই ফলশ্রুতিতেই এদের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমাট বেঁধে উঠেছিল। এই পটভূমিতে ইয়াহিয়া-ভূট্টোর উদ্ধতা ও হঠকারিতা এবং ৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থা, কিছু সংখ্যক ছাত্র ও যুবনেতার উদ্যোগ এবং ২ ও ৩ মার্চ যথাক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও ইশতেহার পাঠের ফলে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন, চাপে পড়ে হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদারদের অতর্কিত হামলা, হানাদারদের বেপরোয়া গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, এই বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আপামর জনগণের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বাঙালী অফিসার ও জওয়ানদের অসম সাহস ও আত্মত্যাগ, লাখোলাখো কৃষক-শ্রমিক-তরুণ-ছাত্র-জনতার অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মাহুতি এবং পাকিস্তানকে ভাঙা ও হীনবল করার স্বার্থে ভারতের সর্বাত্মক সহায়তা এবং অবশেষে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝখানে ভারতের অবস্থানের দরুণ হানাদারদের সাপ্লাই লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতিতেই মুক্তিযুদ্ধ এভাবে সংঘটিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বস্তুতঃ কোন দল বা ব্যক্তির সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নয় বরং ঘটনা প্রবাহই হানাদারদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ থেকে। এককথায়, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পেছনে সুচিন্তিত উদ্যোগ ও পরিকল্পনার তুলনায় প্রেক্ষিত ও ঘটনা পরম্পরারই অবদান ছিল সর্বাধিক। এই বাস্তব সত্যকে আপনারা কি অস্বীকার করেন? এই কি আপনাদের "সত্যিকার" ইতিহাস-নিষ্ঠার প্রমাণ?

২৪. মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ফলে অন্তঃত ১০ লক্ষ বাঙালী আটকা পড়ে গিয়েছিলো তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে, তথা পাকিস্তানে। কিন্তু, এই সব নিরীহ বাঙালীদের আটকে রেখে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টো তড়িঘড়ি করে বঙ্গবন্ধুকেই ৮ জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে ছেড়ে দিলেন কেন? পাকিস্তানের একটা অংশকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন করে ফেলার জন্য ক্ষোভে প্রতিহিংসায় যেখানে সংশ্লিষ্ট "স্বাধীনতার ঘোষক" (?), "বাংলাদেশের জনক" (?) বঙ্গবন্ধুকে বর্বর পাকিস্তানীদের নৃশংসভাবে হত্যা করাই ছিলো স্বাভাবিক, সেখানে উল্টো বাঙালী হত্যাযজ্ঞের প্রধান

www.icsbook.info

হোতা জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বয়ং বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়ে পরম আবেগে - শুভেচ্ছায় বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশে আসার জন্য প্লেনে তুলে দিলেন কেন? কেন জানালেন আবেগময় সম্ভাষণ? তাহলে ব্যাপার কি এই যে, ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা খুব ভালো করেই জানতেন যে, বঙ্গবন্ধু কখনোই পাকিস্তান ভাঙার পক্ষেতো ছিলেনই না, বরং তিনিই চেয়েছিলেন অখন্ড পাকিস্তানকেই রক্ষা করতে? এজন্যই কি বঙ্গবন্ধুর প্রতি ইয়াহিয়া ভুট্টোদের প্রবল মমতা ছিল না? এটাও কি বঙ্গবন্ধুকে তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ নয় যে, তিনি ভুট্টোর কাছে অস্বীকার করেছিলেন যে, বাংলাদেশে ফিরে এসেই তিনি পাকিস্তানের সংগে একটা কনফেডারেশন গড়ার উদ্যোগ নেবেন? অথচ, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে আটকে রাখলে ভুট্টোরা তাঁদের ভারতে আঁটকে পড়া ৯৩ হাজার সৈন্য, অবাঙ্গালীদের বাংলাদেশে ফেলে যাওয়া শিল্প-ব্যবসা-সম্পত্তি ইত্যাদির ক্ষতিপূরণসহ অনেক ব্যাপারেই কঠোর দর কষাকষি বা Bargain করতে পারতো। বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে এমন সুবর্ণ সুযোগইবা তারা হেলায় হারালো কেন? বঙ্গবন্ধুকে তখন ভুট্টোরা আঁটকে রাখলে বা হত্যা করলে কেউ কি পাকিস্তানকে খেয়ে ফেলতো? কে খেয়ে ফেলতো? এসব প্রশ্নে কি উত্তর আপনাদের?

২৫. তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যখন ইতিহাস লেখা হবে, তখন প্রমাণিত হবে যে, মার্কিন নীতি এবং আমাদের স্থানীয় কর্মতৎপরতাই শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখেছে" (এন্ডারসন পেপারস, জ্যাক এন্ডারসন, পৃষ্ঠা-২৭৬)। হেনরি কিসিঞ্জারের এই বক্তব্য এবং ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীই কি প্রমান করে না ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সসম্মানে বেঁচে থাকার প্রকৃত কারণ? প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতপন্থী বিধায় ১৯৭৪ সালেই বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দেন এবং ১৯৭৫ সালে হেনরি কিসিঞ্জার বালাদেশ সফরে এলে কিসিঞ্জার নারাজ হতে পারেন ভেবে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিনকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করা থেকে পর্যন্ত বিরত থাকেন। এ ঘটনাইবা কি প্রমাণ করে?

২৬. বিজয়ের পরপর সম্ভবতঃ সীমাহীন লুটপাট ও তান্ডবকে আড়াল করার জন্যই এমন প্রচন্ড ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়, যেন কেউ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সীমাহীন অপকর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করার সাহস না পায়। তখন কেউ যদি অন্যায় অবিচারের সামন্যতম প্রতিবাদও করতো, অমনি তার উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো কিংবা সাদা জীপে তুলে নেওয়া হতো। সাদা জীপে একবার যাদের তোলা হতো, আর কোনদিন তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যেতো না। এই শ্বেতসন্ত্রাসের ছত্রছায়ায় যে কাজগুলো তখন করা হয়েছিল তা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

www.icsbook.info

ক. প্রতিটি পরিত্যক্ত শিল্প কারখানায় ক্ষমতাসীন দলের এক একজনকে প্রশাসক হিসাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো; শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই এসব প্রশাসকদের না ছিল কোনো অভিজ্ঞতা, না ছিল তেমন শিক্ষাদীক্ষা; তদুপরি অধিগ্রহণের সময় এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কোনো হিসাব বা ইনভেন্টরীও তৈরী করা হয়নি। ফলে অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসকরা নির্দ্বিধায় লুটেপুটে শিল্প কারখানাগুলোকে ছোবড়ায় পরিণত করে দিয়েছিলো।

খ. শিল্প কারখানায় ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে ২/৩ গুণ পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারী ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। যার ফলে পরিত্যক্ত ও অধিগৃহীত শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ শুরুতেই সম্পূর্ণ অলাভজনক ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলো। এই দুর্বহ বোঝার কবল থেকে স্বাধীনতার তিন-চার দশক পরও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা ও ব্যাংক বীমাসমূহ মুক্ত হতে পারলো না।

গ. আন্তর্জাতিক পাটের বাজার চিরতরে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো। এই একই গোষ্ঠীর লোকেরা একদিকে বাংলাদেশের পাট পাচার করে দিয়ে ভারতীয় মুদ্রার নগদ মুনাফা লাভ করতো, অন্যদিকে পাটের শুন্য গুদামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতো। প্রতিটি পাটের গুদামের ক্ষেত্রেই তারা একান্ড ঘটিয়েছিল।

ঘ. অনুরূপভাবে পরিত্যক্ত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, গুদাম-আড়ৎ, সিনেমা হল সবই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা দখল করে নিয়েছিল।

ঙ. অবাঙালীদের বাড়ীঘর, বাণিজ্যিক ভবন, জায়গা-জমিও এই একই গোষ্ঠী আত্মসাৎ করেছিল।

চ. ক্ষমতাসীন দলের লোকদের মধ্যে পাইকারীভাবে বিলি করা হয়েছিল আমদানী লাইসেন্স। থানা পর্যায়ের কর্মীদের সন্তুষ্ট করার জন্যই শুধু দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৭ হাজার নতুন আমদানী লাইসেন্স।

ছ. পারমিট, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের কন্ট্রাক্ট, ডিলারশিপ, ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ইত্যাদিরও একচেটিয়া মালিক হয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের লোক।

জ. এ সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী এসেছিল তার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই আত্মসাৎ করা হয়েছিল। শুধু ভারতে পাচার করা হয়েছিল তৎকালীন মূল্যে প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রী। এই পটভূমিতে দেশীবিদেশী পত্রপত্রিকায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লুটপাট ও রিলিফ চুরির খবরাখবর ছাপা হতে থাকলে, বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি স্নেহমমতা বশতঃ

www.icsbook.info

প্রকাশ্য জনসভা ডেকে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, "এতদিন অন্যেরা খাইছে, এইবার আমার লোকেরা খাইব।" তাঁর দলের লোকদের যারা সমালোচনা করতো, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর ভাষায় বলেছিলেন, "লালঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু"। দিয়েছিলেনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের মাত্রাহীন লুটপাট ও জাতীয় সম্পদ আত্মসাতে অতিষ্ঠ হয়ে যান এবং অপর এক প্রকাশ্য জনসভায় পরম আক্ষেপে বলে ফেলেন, 'চাটার দল সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।" কারা বঙ্গবন্ধু বর্ণিত এই চাটার দল? কারা দেশটাকে তখন খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল? আপনারাই নন কি? জন্মলগ্নেই সেই যে আপনারা বাংলাদেশের অর্থনীতির মাজা ভেঙে দিলেন, তার ফলেই কি বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়নি?

২৭। আপনারা দাবী করছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। এই হিসাব যদি সঠিক হয়, তাহলে প্রত্যেক বৃহত্তর জেলায় গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার জন এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ ৬০০/৭০০ জন মানুষ শহীদ হওয়ার কথা। অথচ আপনাদের দল, আওয়ামী লীগেরই সাবেক এম, পি, এ, জনাব এম, এ মোহাইমেন লিখেছেন যে, তাঁরা বহু চেষ্টা করেও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার (অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার) সর্বমোট শহীদের সংখ্যাকে সাড়ে সাত হাজারের ওপরে নিতে পারেননি। অথচ আগরতলার অত্যন্ত নিকটবর্তী হওয়া এবং সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুণ এই এলাকাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সর্বাধিক। তবু, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অন্যান্য বৃহত্তর জেলায়ও গড়ে এই পরিমাণ মানুষই শহীদ হয়েছেন, তাহলেও সারা বাংলাদেশে মোট শহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কাছাকাছি। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগের গোঁড়া ভক্ত-মুক্তিযুদ্ধকালীন "চরমপত্র" -এর লেখক ও পাঠক এম. আর. আখতার মুকুল পর্যন্ত তাঁর "আমি বিজয় দেখেছি" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ২ (দুই) লক্ষের মতো। অথচ আপনারা বলেছেন যে, এই সংখ্যা ৩০ লক্ষ্য। যদি সত্যিসত্যিই তাইই হয়, তাহলে এই ৩০ লক্ষ শহীদের তালিকা আপনাদের কাছে আছে কি? কোন তালিকাই যদি করা হয়ে না থাকে, তাহলে-কম নয়, বেশি নয়, ঠিক ৩০ লক্ষ শহীদের এই সংখ্যাটি আপনারা পেলেন কোথায়? স্বাধীনতার পর ২০০১ সাল পর্যন্ততো আওয়ামী লীগ দু'বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো। কেন আপনারা তখন শহীদদের কোন তালিকা তৈরী করলেন না? যদি করতেন তাহলে তো শহীদদের সংখ্যা নিয়েও কোন বিভ্রাট হতো না, শহীদ পরিবারদের পূনর্বাসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াও সহজতর হতো এবং হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রজন্ম জানতে পারতো, কাদের প্রাণের মূল্যে অর্জিত হয়েছে তাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আসল কথা কি এই নয় যে, ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি সাংবাদিক

www.icsbook.info

ডেভিড ফ্রস্টকে প্রদত্ত এক সাক্ষ্যতকারে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম শহীদের সংখ্যা ৩ লাখ বলতে গিয়ে ভুল বশতঃ ইংরেজিতে তিন মিলিয়ন শব্দটি বলে ফেলেন? এরপর আপনারাও আর পূর্বাপর চিন্তা না করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অতিভক্তি বশতঃ এই সংখ্যাটিই বলতে থাকেন। আপনাদের এই ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, জনগণের আবেগকে সংকীর্ণ দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য আপনারা মহান শহীদ ও পবিত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও যে কোন দায়িত্বহীন গল্প ফাঁদতে দ্বিধা করেন না? এরূপ মিথ্যাচার কি প্রকৃত শহীদদের প্রতি অবমাননামূলক নয়? আপনাদের বিবেকবুদ্ধি কি বলে?

২৮. একাত্তুরের ২৬ মার্চ আপনারা যে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা ও বিশৃংখলার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিজয়ের পরও ঘটালেন ঠিক একই কান্ড। আতাউল গনি ওসমানি ও স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত লক্ষ লক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সনদ বা সার্টিফিকেটসমূহ যত্রতত্র যাকে তাকে টোটকা ঔষধের বিজ্ঞাপনের মতোই বিলি করে দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট দিস্তা বা শ' হিসাবে বিক্রি হতেও দেখা গেল যেখানে সেখানে। আপনারাই তো মুক্তিযুদ্ধের 'মহান ধারক-বাহক' কেন আপনারা সেদিন এভাবে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা সবাইকে একাকার করে দিয়েছিলেন? এটা কি আপনাদের মহত্ব নাকি সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নির্মম পরিহাস? নিজেরা বাস্তবিকই অস্ত্র হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেননি বলেই আপনারা এই কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করতে পেরেছিলেন, এটাই কি সত্যি নয়? বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতার সাড়ে ৩ বছরে আপনারা বেপরোয়া ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করতে পারলেন, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যাও করতে পারলেন, অথচ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা যথার্থ তালিকা তৈরী করতে পারলেন না কেন? অবশ্য, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) আপনাদের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তি বার্তা শীর্ষক কাগজে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০৮ জন জীবিত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটা তালিকা প্রকাশ করে বটে। কিন্তু অভিযোগ ওঠে যে এই তালিকায় এমন সব ব্যক্তিদেরও নামধাম রয়েছে যারা আদৌ মুক্তিযুদ্ধ করেনি বা ১৯৭১-এ যাদের জন্ম বা যুদ্ধ করার বয়সই হয়নি (সরকারের শতদিন ও মুক্তিযোদ্ধা, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বীর প্রতীক)। আপনাদেরই এই তালিকা অনুযায়ী জীবিত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত সংখ্যাই যদি হয় ১,৬৭,৭০৮, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের দাবীটা আপনারা করেছেন কোন ভিত্তিতে? রাজাকার আলবদরদের আপনারা গাল দেন। কিন্তু আপনারা যারা এসব কান্ড-কীর্তন করেছেন, তারা রাজাকার-আলবদরদের তুলনায় কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর? কি দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? কেন বেকার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের আজো বাঁচার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করতে হয়? কারা দায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের এই পরিণতির জন্য?

www.icsbook.info

২৯.পৃথিবীতে সর্বদেশে সর্বকালে যাঁরাই বিপ্লব সাধন করেছেন, তাঁরাই পুরানো প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো পাল্টে বিপ্লবের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কাঠামো প্রবর্তন করেছেন (স্ব স্ব ধরনের বিপ্লবের স্বার্থে লেলিন-মাও সেতুঙ যেমন জার বা চিয়াং কাইশেক-এর প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো রাখেননি, ইমান খোমিনীও তেমনি রাখেননি শাহ-এর আমলের কোন কাঠামো। কিম ইল স্যুৎ, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, মুয়াম্মার গাদ্দাফী, সাদ্দাম হোসেন-সকলের ব্যাপারেই একই কথা)। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর যে ক্ষমতা ও ইমেজ ছিল, তা গোড়াতে লেনিন-মাও সেতুঙ কারুরই ছিল না। তখন যদি উপনিবেশিক সমস্ত কাঠামোকে তুলে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হতো, তাহলেও টুশব্দটি উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা এদেশের কারুরই হতো না। কিন্তু এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয় অর্জনের পর করা হলোটা কি? সেই বৃটিশ এবং পাকিস্তানী আমলের উপনিবেশিক প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামোকেই হুবহু বহাল রাখা হলো। বহাল রাখা হলো একই ব্যক্তিবর্গকেও। এখন যাকে স্বৈরাচারী বলে অষ্টপ্রহর গাল পাড়া হচ্ছে, তখন সেই হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকেও দেরাদুনে পাঠিয়ে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে এনে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বহাল করা হয়েছিল। আর যারা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, পৃথিবীর বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছিল, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন-কাঠামো কিংবা দেশ পুণর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আত্মস্থ বা ইনষ্টিটিউশনালাইজড করা হলো না। তাদের অনেকেরই স্টেনগান ধরা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো ব্রিফকেস আর মদের বোতল; আমদানী লাইসেন্স আর লুটের বখরা। আর বাদবাকী বিশাল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের যে কে কোথায় গেল, জীবিকার কোন উপায়ই তারা করতে পারলো কি পারলোনা, তার কোন খোঁজই আপনারা নিলেন না। আপনারাই তো মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ধারক-বাহক। আপনারা জবাব দিন, পৃথিবীতে কবে কোন দেশে এ ধরনের কান্ড ঘটেছে? কেন আপনারা উপনিবেশিক কাঠামোসমূহকে ভাঙার বদলে আরও মজবুত করলেন? কেন মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সংগে আত্মস্থ ও পুনর্বাসিত করলেন না? কেন মুক্তিযোদ্ধা, অমুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান ফেরৎ সবাইকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললেন? মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, লক্ষ লক্ষ শহীদ এবং বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের প্রতি এর চেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা কি আর কিছুই হতে পারে?

৩০. আপনারাতো মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সমস্ত অবদান বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর দলের ওপর আরোপ করেই চলেছেন। অথচ, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ, আওয়ামীলীগ দলীয় সাবেক এম,সি,এ জনাব এম, এ, মোহাইমেন বলেছেন, "সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এমন কি নভেম্বরের (১৯৭১) প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শেখ সাহেব মুক্ত হয়ে যদি আমাদের ডাক দিয়ে বলতেন, আমার ছয় দফা দাবী পাকিস্তান

www.icsbook.info

সরকার মেনে নিয়েছে, তাই তোমরা সবাই ঢাকা চলে আসো, তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আওয়ামীলীগ সদস্যদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে (ভারত থেকে) ঢাকা চলে আসতো" (ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, পৃষ্ঠা-১২৭)।

তিনি আরও বলেছেন, "তাজউদ্দিন কর্তৃক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করে দেশ স্বাধীন করাকে শেখ সাহেব সন্তুষ্টির সংগে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল, কিন্তু ছাত্রজনতা হত্যার মারফত সাময়িকভাবে হলেও তারা অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে এবং এক বছর কি দের বছর পরে হলেও জাগ্রত জনতার আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করে তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করে পারবে না। কিন্তু তাঁর সে হিসাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাজউদ্দিন যে সীমান্ত দেশ স্বাধীন করে ফেলতে পারবে, এটা তিনি (শেখ মুজিব) কল্পনাই করতে পারেননি। .....দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁর গ্রেফতার হওয়ার পরে দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল, সে সময়ে কে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কার অবদান কতটুকু ছিল, এ সম্পর্কে তিনি কোনদিন কোন খবরই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে কখনো কোন আলোচনাও হতে দেননি। বাহাত্তুরের দশই জানুয়ারী থেকে পঁচাত্তরের পনরই আগষ্ট পর্যন্ত রেডিও টেলিভিশন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একাত্তুরের পঁচিশে মার্চ থেকে বাহাত্তুরের নয়ই জানুযারী পর্যন্ত সময়টুকু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা হয়ে আসছিল, কারণ ওই সময়ে তিনি (শেখ মুজিব) ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত.....। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর '৭৫ সনে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সতরই এপ্রিল, যেদিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কুষ্টিয়ার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেছিল, সে তারিখটি চারবার এসেছিল।.....কিন্তু শেখ সাহেবের জীবিতকালে ঐ স্থানে তিনি নিজে তো কোনদিন যানইনি, এমনকি পার্টির কাউকে যেতেও দেননি। ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানও হতে দেন" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫)। এ প্রসঙ্গে ৬ দফার প্রণেতা ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস বলেছেন, "তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করেননি, কি কষ্ট আমরা করেছি অথবা কি যন্ত্রণা আমরা সয়েছি কিংবা যুদ্ধ করেছি কিভাবে" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি আই এ, মাহমুদল হক , পৃষ্ঠা-৯৮)। রুহুল কুদ্দুস আরও বলেছেন, "অথচ এই রঙ্গবন্ধুই পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফিরেই ক্যান্টনমেন্টে চলে যান পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দু:খ-দুর্দশা দেখতে" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮)। কেন ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ রাত ৩টার সময় স্বয়ং জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন?

www.icsbook.info

বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দু'বার বঙ্গবন্ধু-ভুট্টো বৈঠক হয়। ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ফরাসী সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালাসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেন, "লন্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার আগে আমি দু'বার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি (বঙ্গবন্ধু) কুরআন স্পর্শ করে শপথ নেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন" (ইন্টারভিউ উইথ হিষ্ট্রি, ওরিয়ানা ফ্যালাসি, পৃঃ ১৯৭)। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু একথার কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেননি । উপরন্তু, লন্ডনের হোটেলে সাংবাদিক এন্থনি ম্যাস্কারানহাসকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আপনার জন্য একটা দারুণ খবর আছে। এখনো কেউ জানে না খবরটি। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক রাখতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না এ নিয়ে অন্য সবার সঙ্গে কথা বলছি ততক্ষণ এর বেশি কিছু বলতে পারবো না। দোহাই আল্লাহর তার আগে কিছু লিখবেন না। (লিগেসি অব ব্লাড, এন্থনি ম্যাসকারনহাস, পৃঃ ৫) এরই বা অর্থ কি? এটাইবা পাকিস্তানের প্রতি বঙ্গবন্ধুর কি মনোভাব প্রকাশ করে? এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭২ সালের ২১-২৩ জুলাই দ্বিধাবিভক্ত মুজিববাদী ছাত্রলীগের দু'অংশ দু'টি সম্মেলন আহবান করে। একটি আহবান করেছিলেন প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী আ স ম আবদুর রব, স্বাধীনতার প্রথম ইশতেহার পাঠকারী শাজাহান সিরাজ প্রমুখ। অন্যটি সিদ্দিকী মাখন প্রমুখ। উভয় সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারীও ইশতেহার পাঠকারীদের সম্মেলনে যাননি; তিনি গিয়েছিলেন অপর সম্মেলনটিতে। উপরোক্ত ঘটনাসমুহইবা কি প্রমাণ করে? কেন বঙ্গবন্ধু সেই বিভীষিকাময় নয় মাসের কথা জানতে চাইতেন না? কেন তাঁর শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা রেডিও-টেলিভিশনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? কোন দরদ বা সহানুভূতির কারণে পাকিস্তান থেকে ফিরেই তিনি ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দু:খ-দুর্দশা দেখতে গিয়েছিলেন? কেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমি মুজিবনগরে নিজেও কোনদিন যাননি, অন্য কাউকে যেতেও দেননি? কেন বঙ্গবন্ধু লন্ডনে ম্যাসকারানহাসের কাছে এরকম মন্তব্য করেছিলেন? বঙ্গবন্ধু কি আসলেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? নাকি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা? অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার? কেন আপনারা বঙ্গবন্ধু যা ছিলেন না, তাঁর ওপর তাইই চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের যথার্থ অবদান সমূহকেও বিতর্কিত করে তুলেছেন? কেন আপনারা আসল বঙ্গবন্ধুকে আড়াল করে উপস্থাপন করেছেন এক নকল বঙ্গবন্ধুকে?

৩১. মুক্তিযুদ্ধকালীন বিএসএফ-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান গোলক মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার নেন শাহরিয়ার কবির। এতে গোলক মজুমদার বলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ ল' অফিসার কর্ণেল বেইস এর উদ্যোগে ভারতের অন্যতম

www.icsbook.info

কন্সটিটিউশনাল ল' ইয়ার সুব্রত রায় চৌধুরী কোলকাতায় বসে মাত্র ৩দিনে বাংলাদেশের সংবিধান বা কন্সটিটিউশন তৈরী করে দেন। সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয় দৈনিক জনকণ্ঠে। এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি? আপনাদের সংবিধান কি তাহলে ওদেরই তৈরী?

৩২. আপনাদের অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদারদের রাজত্বকালে (১৯৭২-৭৫) বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার সামান্য কয়েকটি এখানে উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যাক:

The Statesman ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, The man (Sheikh Mujib). Who takes all the major and most of the minor decisions in Bangladesh is surrounded by flatterers and sycophants, the prisoner of his vanty, caught between insecurity and arrogance, sold on the myths his acolytes peddle him -that he is the saviour of his people and that is all they know and all they need to know. "The New York Times ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, 'Sheikh Mujib's associates concede that he is a poor administator .....his loyalties are to his family and the Awami league. He does not believe that they are corrupt and can betray him". The Daily Telegraph এর প্রতিবেদক Peter Gill ৬ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখলেন, Bangladesh is sinking steadily into unchartered depaths of human misery. Sheikh Mujib, who a week ago assumed dictatroial powers under a new state of emergency, seems incapable of firm or effective govermment .....Sheikh Mujib, who is described as "the best liability Bangladesh has got" both revered as father figure and denounced as incompetent"। প্রতিবেদক Kevin Raffferty. The Financial Times এর ৬ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখলেন, "Clearly it is a loosing battle, Bangladesh is growing poorer everyday. Difficult as it is to immagine, the economy today is in a worse state then at devasatated independence .....Mr. Tony Hagen, the founder of the vast UN aid operation estimated that only one-seventh of relief goods reached the persons to whom it was intended .....Nobody knows the extent of corrupution the country. Some foreigners estimate that upto 2 million tons of rice and I million bales of jute are annually taken across into India. The Economist পত্রিকার ৩১ আগষ্ট, ১৯৭৪ সংখ্যায় লেখা হয় Mujib is a weak man..... The Mujib junta never fought in the freedom struggle and those who

www.icsbook.info

did fight. 20.000 of them are in Mujib's jail." জানুয়ারী ২০, ১৯৭৫ সংখ্যায় kansas Times লিখেছিল, "In a normal socicty, if a man is robbed he loses his money. But in Bangladesh if a man is robbed he loses his life". The Guardian জানুয়ারী ৩১.১৯৭৫ সংখ্যায় লেখে, "A foreign Newspaper report on starvation and Management, with sheiks Mujib himself as vilain, was recently reprinted on the leader page of times of India. Criticism of his ostrich like failure to control corruption has now crept into cartoons and editorials.

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর এহেন দুরবস্থা কারা করেছিল? কারা তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল? আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও শ্বেত সন্ত্রাসের এই দু:সময়কেই আপনারা বলেছেন' 'স্বর্ণযুগ'। স্বর্ণযুগই বটে। কিন্তু কাদের? জনগণের? না আপনাদের?

৩৩. ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পর্যন্ত পৃথিবীতে "মুজিববাদ" কোন শব্দের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং বা তাঁর দল বা কোন ভক্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত কখনো কোথাও "মুজিববাদ"-এর কথা বলেননি। বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানে, তখনই তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৯৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে ভারতে তিন স্তম্ভ-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে মুজিববাদের জন্ম হয়ে গেল। বিজয়ের পর আর এক স্তম্ভ (জাতীয়তাবাদ) লাগিয়ে মোট চার স্তম্ভ করা হলো। বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধিদানকারী .....তোফায়েল আহমদ ১৭-২-৭২ তারিখে ঘোষণা করলেন "লিঙ্কনীয় গণতন্ত্র এবং মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ই হলো মুজিববাদ"। লিংকনীয় বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শনের বিচারে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। অথচ এই দু'টোকেই জুড়ে দেওয়া হলো মুজিববাদের মধ্যে (সম্ভবতঃ মুজিববাদের উদ্ভাবকরা জানতেনই না যে, সমাজতন্ত্র, তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কিন্তু দু'টো শব্দই তাঁদের কাছে মুখরোচক মনে হওয়ায়, বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা চিন্তা না করেই দু'টোকেই তাঁরা একত্রে জুড়ে দিয়েছিলেন। মুজিববাদের উদ্ভাবকেরা সম্ভবতঃ এটাও জানতেন না যে, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য অপরিহার্য দ্বান্দিক পদ্ধতি ও মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ক্যাডার ও নেতৃত্ব; অথচ আওয়ামী লীগ ছিল একটি শিথিল পেটিবুর্জোয়া সংগঠন এবং মার্কসীয় বিচারে এর নেতা কর্মীদের চরিত্র ছিল সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল, ফলে এরূপ নেতৃত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্র কায়েম কখনোই সম্ভবপর ছিল না)। এখন প্রশ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে, তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কে বা করা 'মুজিববাদ' আবিস্কার করলো? কি উদ্দেশ্যে করলো? মার্কসবাদ, নাৎসীবাদ ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বে একমাত্র মুজিববাদই এসেছে যাঁর নামে "বাদ" তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এবং তাঁর লিখিত কোন দর্শনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে।

www.icsbook.info

অন্যের মাধ্যমে আসা "বাদ" মুজিববাদ হয় কি করে? আজ সেই মুজিববাদের অবস্থান ও পরিণতিইবা কি? আপনারা কি আজো আপনাদের সেই সোনার পাথরবাটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একই সংগে কায়েম করতে চান? এরকম একটা 'উদ্ভট বাদ' সরলপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনারা কি সত্যিই তাঁকে মহৎ করেছেন? নাকি তাঁকে খেলো ও হেয় প্রতিপন্ন করেছেন? এ অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পূনরায় ক্ষমতায় এসেও আপনারা মুজিববাদ কায়েমের কোন চেষ্টা করলেন না কেন? তাহলে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন যে, মুজিববাদ একটি অবাস্তব বোগাস জিনিস, যার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কোনই সম্পর্ক নেই?

৩৩. আপনারা তো তারস্বরে দাবী করে আসছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সময়ে অর্থাৎ যখন আওয়ামী লীগ বা বাকশাল ক্ষমতায় ছিলো, কেবল তখনই বাংলাদেশে বলবৎ ছিল অবারিত উদার গণতন্ত্র এবং অন্যান্য সব আমলেই বলবৎ ছিল জঘন্য স্বৈরতন্ত্র। রাজনীতিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ আমলাদের নাক গলানোর বিরুদ্ধেও আপনারা আবেগ থরথর বক্তব্য রাখছেন এবার দেখা যাক কি ছিলো বঙ্গবন্ধুর আমলে আপনাদের গণতন্ত্রের স্বরূপ;

ক. বিজয়ের পর থেকে '৭৫ এর ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে আপনারা সিরাজ সিকদার, এ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন সহ অন্তত: ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছিলেন এবং কোনো থানাকে এসব হত্যার বিরুদ্ধে একটি মামলাও গ্রহণ করতে দেননি। এছাড়া কতো বাড়ীঘর যে আপনারা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, কতোজনকে যে সর্বস্বান্ত করেছিলেন, কতো মানুষকে যে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন তার তো কোন সীমাসাক্ষ্যই নেই

খ. ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে আপনারা মার্কসবাদী নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন, পূত্রবধু রীনা সিনহা (১৯) এবং পাশের বাড়ীর হনুফা বেগম (১৬) কে রক্ষীবাহিনী দিয়ে উঠিয়ে আনেন। তারপর তাদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, সে তুলনায় পাকিস্তান আমলে ইলা মিত্রের ওপর নির্যাতন কিংবা আলজিরিয়ার জমিলা বুইরেদের ওপর নির্যাতনও ছিলো নিতান্তই তুচ্ছমাত্র। আপনারা বৃদ্ধা অরুণা সেনকে হাত পা বেঁধে কাতোবার যে নদীতে ডুবিয়েছেন এবং তুলেছেন তার কোনই হিসাব নেই। এভাবে হাজার হাজার অরুণা সেনকে আপনাদের 'উদার গণতন্ত্রের' শিকার হতে হয়েছিল

গ. ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের মিছিলের ওপর গুলী চালিয়ে আপনারা অন্তত ২০ জন মানুষকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করেন (সরকারি হিসাব অনুযায়ীই নিহতের

www.icsbook.info

সংখ্যা ছিল ১২) এবং পরদিন স্বয়ং আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এভিন্যুস্থ জাসদ অফিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেন।

ঘ. পুলিশ পাঠিয়ে দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয় সীজ করেন এবং আঘাত হানেন চট্টগ্রামের দৈনিক দেশ বাংলা, দৈনিক ইষ্টার্ন এক্সমিনার, ঢাকার ওয়েভ, গণশক্তি, লালপতাকা, মুখপত্র, স্পোকসম্যান, নয়াযুগ, প্রাচ্য বার্তাসহ অসংখ্য পত্রপত্রিকার ওপর।

ঙ. ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করেন এবং এর ১১৭ ক (৪) ধারা অনুযায়ী ২৪-২-৭৫ তারিখে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একক দল "বাকশাল" গঠন করেন এবং হুবহু হিটলার ও মুসোলিনীর নাৎসী দলের অনুকরণে আওয়াজ তোলেন,"এক নেতা একদেশ; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ"।

চ. সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারীদেরকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাকশালের সদস্য হতে বাধ্য করেন এবং এভাবে তাঁদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে সরাসরি রাজনীতিতে টেনে আনেন। বাকশাল গঠনের পর আপনারা জেলায় জেলায় যে ৬০ জন বাকশালী গভর্নর নিয়োগ করেন, তার মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট।

ছ. ১৯৭৫ সালের জুন মাসে চারটি মাত্র পত্রিকাকে সরকারি মালিকানায় নিয়ে বাদবাকি সমস্ত পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেন এবং এভাবে বিরোধী মতামতকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেন।

জ. আপনারাই বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করেন,

ঝ. যেসব ব্যাংক বীমা বা শিল্প কর্মকর্তা আপনাদের নির্দেশ মতো চাঁদা দিতে বা বেহিসাবে লোক নিয়োগ করতে অপারগতা প্রকাশ করে, তাদেরকে লালবাহিনী দিয়ে ধরিয়ে এনে প্রকাশ্য রাজপথে বেদমভাবে পিটিয়ে দেন এবং গায়ের জোরে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে ব্যবস্থা রাখেন যে, যারা বাকশালের সদস্য হবে না তাদের সংসদের সদস্যত্ব হারাতে হবে; ফলে জাসদের মাইনুদ্দিন আহমদ মানিক ও আব্দুল্লাহ সরকার সদস্যত্ব হারান। অগণতান্ত্রিক চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদ করার দরুণ এবং বাকশালে যোগদান না করার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আতাউল গনি ওসমানি এবং ব্যারিষ্টার মাঈনুল হোসেনের সদস্যপদও বাতিল হয়ে যায়। এবার বলুন, সেনাবাহিনী, আমলা ও পুলিশদের রাজনীতিতে টেনে এনেছিল কারা? সব দল নিষিদ্ধ করে একদল গঠন করা এবং তাতে সবাইকে যোগ দিতে বাধ্য করা কোন ধরনের গণতন্ত্র? কোন ধরনের গণতন্ত্র দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া? কোন ধরনের

www.icsbook.info

গণতন্ত্র লালবাহিনী, যুবলীগ প্রভৃতি অসাংবিধানিক বাহিনীর হাতে অস্ত্র এবং যখন যা খুশী তা করার অবাধ অধিকার অর্পণ করা? প্রচলিত আইনকে পাশ কাটিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য গায়ের জোরের আইন (চতুর্থ সংশোধনী) জারি করা? কোন ধরনের আইনের শাসন হাজার হাজার বিরোধী নেতা-কর্মীকে হত্যা করা এবং মামলা করতে না দেওয়া? আগেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে The Economist. ১১ আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "The Mujib junta never fought in he freedom struggle and theose who did fight 20.000 of them are in Mujib's jail. এধরনের গণতন্ত্রের কথা কি কখনো আব্রাহাম লিঙ্কন বা আর কেউ কখনো বলেছেন? এগুলোই যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার ও বর্বরতার সজ্ঞা কি? (১৯৯৬-২০০১, শেখ হাসিনার সরকারের আমলের বৃত্তান্ত পরবর্তীতে প্রদত্ত)।

৩৫. ১৯৭১ সালে রাজাকার, আলবদর ও শান্তি কমিটিসমূহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। হানাদারদের দোসরবৃত্তি করেছিলো। নরহত্যা ও নারীধর্ষনের সহযোগি হয়েছিলো। কিন্তু কারা ছিল এই রাজাকার-আলবদর? এদের প্রতি কি ছিল বঙ্গবন্ধুর আচরণ ও সৃষ্টিভঙ্গী? এব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মী, তৎকালীন পাবনা জেলা গভর্ণর ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ রচিত "ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস; বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড" শীর্ষক গ্রন্থে বিবৃত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যাক। এই গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, রাজাকার বাহিনী ছিল সরকারি বাহিনী এবং এর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব আবদুর রহীমকে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েটের প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। এই গ্রন্থেরই ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সাল থেকেই পাকিস্তান আর্মীর প্যারামিলিটারী হিসাবে গঠিত হয়েছিল আলবদর বাহিনী। এর অন্যতম সংগঠক জনাব মুসলেহ উদ্দিনকে বঙ্গবন্ধুই এনএসআই-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। একই গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শান্তিবাহিনী প্রধান খাজা খায়ের উদ্দিনকে জেল থেকে বের করে এনে নিজ বাসায় খাইয়ে দাইয়ে টিকেট কাটিয়ে পাকিস্তান প্রেরণ করেছিলেন। যে খাজা কায়সার চীনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হিসাবে মাও সেতুঙ ও চৌ এন লাই-এর সঙ্গে হেনরি কিসিঙ্গারের বৈঠকের বন্দোবস্ত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন দুই বৈরী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই খাজা কায়সারকে বঙ্গবন্ধুই বার্মার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উপরোক্ত ভূমিকা সম্পর্কেইবা আপনাদের মূল্যায়ন কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে সাজা দেওয়া হয়েছিলো যুদ্ধাপরাধীদের। কিন্তু আপনারা দু'বার ক্ষমতায় গিয়েও কেন সাজা দেননি রাজাকার আলবদরদের? কোথায় আপনাদের দূর্বলতা?

www.icsbook.info

৩৬. মুক্তিযুদ্ধের সময়, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যারা বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল-এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর পর আপনারা ১৫০০ জন পাকিস্তানীকে যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিতও করেছিলেন। এতোজন পাকিস্তানীকে শাস্তি দেওয়ার মুরোদ আপনাদের নেই-একথা বুঝতে পেরে পরবর্তীতে আপনারা যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যা কমিয়ে ১৯৫ জনে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ১৯৫ জনের একজনের কেশাগ্র স্পর্শ করাও আপনাদের সাধ্যে কুলোয় না। বাংলাদেশের মতামতের কোন তোয়াক্কাই না করে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সিমলা চুক্তি সম্পাদিত করে এবং তদনুযায়ী ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ আত্মসমর্পণকারী ৯৩০০০ পাকিস্তানী সৈন্যের সকলকেই পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করে দেয় এবং বিনিময়ে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মুক্ত করে নেয়। আপনাদেরই দ্বারা চিহ্নিত মূল অপরাধীদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আপনারা লেগে পড়লেন রাজাকার-আলবদর ধরার নামে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জিঘাংসার কাজে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি জারি করা হলো বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ, ১৯৭২। এই আইনে ৩৭,৪৩১ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে বিচার হয় ২৮৪৮ জনের। বিচারে মাত্র ৭৫৬ জন দন্ডপ্রাপ্ত হয় এবং ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। অর্থাৎ দেখা যায় যে, দালাল আইনে বন্দীদের শতকরা ৭০ জনই ছিল নিরাপরাধ। এই প্রহসন বুঝতে পেরে, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকল ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাঁরই ব্যক্তিগত নির্দেশে সকলকে এক সপ্তাহের মধ্যে মুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা তৃতীয় বিজয় দিবসে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। মোট কথা, ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই স্বহস্তে এই ইস্যুর কবর দিয়ে দেন। এই পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন কি? যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার আলবদরদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর কি ছিলো দৃষ্টিভঙ্গী?

৩৭. তাছাড়া চাইলেও ইসলামপন্থীদের ভারত যাওয়ার কোন পথই কি আপনারা খোলা রেখেছিলেন? আপনাদের কি মনে আছে মাওলানা ভাসানী, কমরেড ফরহাদ, কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ যেসব অ-আওয়ামীলীগার অথচ যথার্থই অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নেতারা ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁদের এবং তাদের কর্মীদের প্রতি আপনারা কি আচরণ করেছিলেন? সরকারের কোনো স্তরে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের কোনো পর্যায়ে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রক্রিয়াতেই আপনারা তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করেননি। মাওলানা ভাসানীকেতো কার্যতঃ অন্তরীণাবদ্ধ করেই রাখা হয়েছিল, অথচ তিনিই ছিলেন রাজনীতির অংগনে স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট প্রবক্তা। তাঁদের মতো প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদেরই যেখানে আপনারা হালে

www.icsbook.info

পানি পেতে দেননি, সেখানে কুরআন সুন্নাহর শাসন চায় এমন টুপি-দাড়িধারী ব্যক্তিরা ভারত গিয়ে উঠলে তাদের পরিণতি কি হতো? তাদের আপনারা কি আদৌ বুকে টেনে নিতেন? মুক্তিবাহিনীতে স্থান দিতেন? ভারতের হিন্দু সরকারও কি তাঁদের আদৌ আশ্রয়, অস্ত্র ও টেনিং দিতো? আপনারা অত্যন্ত ভালো করেই জানেন, ইসলামপন্থীদের ভারতের মাটিতে পেলে আপনারা তাদের এক মুহূর্তও বরদাস্ত করতেন না; আশ্রয়, অস্ত্র ও টেনিং দেওয়াতো দূরের কথা, আপনারা এবং দাদারা মিলে তাদের দেখামাত্রই কচুকাটা করে ছাড়তেন। এমতাবস্থায়, প্রাণে বাঁচতে হলে ইসলামপন্থিদের এদেশে থেকে যাওয়া ছাড়া অপর কোন গত্যান্তর সত্যিই ছিল কি? রাজাকার আলবদরদের বর্বরতা ও হানাদারদের দালালীর অতি ঘৃণ্য কর্মকান্ডের কথা সর্বাংশে স্বীকার করেও অনেকেই মনে করেন যে, ইসলাম ও ইসলমাপন্থীদের প্রতি আপনাদের ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের অন্ধ আক্রোশের কারণেই এঁদের অনেকের পক্ষে ইচ্ছা করলেও ভারতে যাওয়া সম্ভবপর ছিলোনা। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাউকেই ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্র নিরপেক্ষ থাকতে দিচ্ছিলো না। রাজাকার আলবদরদের ক্ষমার অযোগ্য ঘৃণ্য ভূমিকার পাশাপাশি এই দিকটিও কি কমবেশি সত্যি নয়?

৩৮. হানাদার পন্থীরা আরও বলেন যে, ১৯৭১ সালে ইসলামপন্থীরা আরো তিনটি যুক্তিতে ভারতকেন্দ্রিক, ভারতভিত্তিক ও ভারতনিয়ন্ত্রিত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমতঃ তাদের ভয় ছিল যে, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে এতদঞ্চলে ইসলামের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে পাকিস্তান ইসলামের দেশ, সুতরাং আল্লাহই এদেশকে ভাঙতে দেবেন না। তৃতীয়তঃ তাঁরা আশংকা করেছিলেন যে, ভারতের আশ্রয়, সহায়তা টেনিং ও নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে অর্জিত বাংলাদেশ কার্য্যতঃ ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থেরই লীলাভূমিতে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য, ইসলামপন্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা যথার্থ বা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এতদঞ্চলে ইসলাম আদৌ বিপন্ন হয়নি; বরং ইসলামের প্রতি মানুষের নিষ্ঠাই আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অখন্ড পাকিস্তানকে রক্ষা করাও আল্লাহর আদৌ ইচ্ছা ছিলোনা এটাও প্রমাণিত। কিন্তু তাঁদের তৃতীয় শংকাটি? সেটাও কি পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হয়েছে? বিজয়ের পর বাংলাদেশ সরকারকেই বাংলাদেশে আসতে না দেওয়া, ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট, আন্তর্জাতিক পাটের বাজার দখল, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে বাংলাদেশের মতামতের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ, বাংলাদেশের বাজেট বাংলাদেশের পার্লামেন্টে পেশ হওয়ার আগেই আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে ঘোষণা, তালপট্টি দ্বীপ দখল, গঙ্গা ও তিস্তার বাঁধ নির্মাণের

www.icsbook.info

মাধ্যমে একতরফা পানি প্রত্যাহার, ব্রহ্মপুত্রেও বাঁধ দেওয়ার আয়োজন, তিন বিঘা করিডোরের ওপর ভারতের একক নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশকে ভারতের বৈধ-অবৈধ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে রূপান্তর, বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের আমদানিকৃত পণ্য ভারতে পাচারের ব্যবস্থা, অপারেশন পুশ ব্যাক, বঙ্গসেনা ও শান্তিবাহিনী ইত্যাদির সৃষ্টি ও সযত্ন লালন, বেপরোয়া পণ্য আগ্রাসন, বাংলাদেশের সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দান, বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্র প্রমাণের অপপ্রয়াস, বিভিন্ন সীমান্তে এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বি এস এফ এর নিত্য হামলা ইত্যাদি কি একথারই প্রমাণ করে না যে ১৯৭১-এ ইসলামপন্থীদের ভারত সম্পর্কিত ভয় ও আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না? বামপন্থী বা কম্যুনিষ্ট সংগঠন সমূহের অনেকেও কি একই কারণে ভারতে গমন থেকে বিরত থাকেনি এবং ভারতীয় ভূমিকার বিরোধীতা করেনি (যেমন, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, সিরাজ সিকদার প্রমুখের নেতৃত্বাধীন সংগঠন)?

৩৯. এভাবে দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, রিলিফ আত্মসাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনীক শ্রেণী সৃষ্টি, হত্যা-নির্যাতন, হাইজ্যাক, কালাকানুন, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, একদলীয় স্বৈরাচার, অন্ধভারত ভক্তি, দুর্ভিক্ষ, পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে আপনারা দেশকে এক মহাবিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে এলেন। অথচ আইয়ুব খানের চাটুকার মোসাহেবরা যেমন আইয়ুব খানকে বোঝাতো, "সদরে পাকিস্তান, সব কুছ ঠিক হ্যায়, তামান জনগণ আপনার জন্য ফানা", ঠিক তেমনি আপনারাও বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতেন, "জনগণ মহাসুখে আছে, বাকশাল কায়েম করায় জনগণের খুশীর কোন অন্ত নাই, বঙ্গবন্ধু বলতে জনগণ একেবারেই অজ্ঞান এবং যতোদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকবে, ততোদিন বাকশালকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর কারুর সাধ্য নেই" ইত্যাদি। এমতাবস্থায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। অথচ আপনারা, যাঁরা বঙ্গবন্ধুরই বদৌলতে, তাঁরই নাম ভাঙিয়ে নেতা মন্ত্রী এমপি জেলা গভর্ণর ইত্যাদি হয়েছিলেন, রাতারাতি বাড়ী গাড়ী সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিতে, প্রতিষ্ঠানে বড়বড় পদ বাগিয়েছিলেন, তাঁরা কোন প্রতিরোধ দূরে থাক, তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ৫ জন লোকের একটা মিছিল পর্যন্ত বের করলেন না। অথচ আপনাদের অনেকের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো সেলাই করে দিলেও বঙ্গবন্ধুর ঋণ শোধ হতো কিনা সন্দেহ। তা সত্বেও সেদিন আপনারা বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার সামান্যতম প্রতিবাদও করলেন না কেন? কর্নেল ফারুক রশীদ ডালিমদের ভয়ে? কুড়িগ্রাম, কক্সবাজার কিংবা পটুয়াখালীতে ফারুক রশীদদের তখন কি এমন শক্তি ছিল? ঢাকা শহরের বাইরে কোথাও তাদের ট্যাঙ্ক কামান ছিল? কেন আপনারা অন্ত তঃ ঢাকার বাইরে হলেও সামান্যতম মিছিল বিক্ষোভ টুকুও করলেন না? রক্ষীবাহিনী

www.icsbook.info

ছিল আওয়ামী লীগের একান্ত নিজস্ব গেষ্টাপো বাহিনী। এর আসল প্রধান ছিলেন স্বয়ং তোফায়েল আহমদ কেন তাঁরা সেদিন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি বুলেটও ছুঁড়লেন না? কেন তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা) জেনারেল শফিউল্লাহ বাধ্য বালকের মতো ডালিমের সঙ্গে গিয়ে খোন্দকার মোশতাকের কাছে আনুগত্য ঘোষণা করে এলেন? কেন তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই কালরাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার উদ্যোগই নিলেন না? আপনারা তো দাবী করেছেন, আপনারাই ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে ফেলেছেন। সেদিন আপনাদের তথাকথিত বীরত্ব কোথায় ছিল? নাকি রক্ষীবাহিনীর নীরবতার পেছনেও ছিল আপনাদের গভীর ষড়যন্ত্র? বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে না পারলেও একটি কাজ কিন্তু আপনারা ঠিকই করতে পেয়েছিলেন? বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ তখনো ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীর সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে, তখনো পড়ে আছে বেগম মুজিব, তাঁর সন্তান ও পুত্রবধুদের লাশ। শেখ মনি ও তার স্ত্রীর লাশ। আর আপনারা সেই সব লাশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কাজে, নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের প্রতিযোগিতায়। কি ব্যাখ্যা আপনাদের এই আচরণের?

৪০. বঙ্গবন্ধুকে সহপরিবারে হত্য কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। শিশু রাসেল, আবদুরর সেরনিয়াবাতের শিশুপুত্র, শেখ কামাল ও শেখ জামালের সদ্য বিবাহিতা তরুনী স্ত্রীদ্বয়, বেগম মুজিব, শেখ মনির স্ত্রী আরজু মনি প্রমুখকে হত্যা অবশ্যই অতি অমানবিক ও চূড়ান্ত বর্বরোচিত কাজ। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাস কি প্রমান করেনা যে, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কদের সর্বদেশে সর্বকালে হতে বাধ্য এমনই পরিণতি? বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও একথাতো স্বীকার করতেই হবে যে তিনি বাস্তবে পরিণত হয়েছিলেন বা তাঁকে পরিণত করা হয়েছিলো একটা ফ্যাসিষ্ট দানবে। সব দল নিষিদ্ধ করে এক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, চারটি সরকারি পত্রিকা বাদে দেশের সমস্ত পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করণের মাধ্যমে মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পদদলিত করা, সশস্ত্র বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সদস্যদেরও একক রাজনৈতিক দল বাকশালে যোগদানে বাধ্যকরা ইত্যাদির সমাহার যদি ফ্যাসিবাদ না হয় তাহলে ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা কি? হিটলার বা মুসোলিনীর নাৎসী ব্যবস্থার সঙ্গে বাকশাল ব্যবস্থার আদৌ কি কোন তফাৎ ছিলো? থাকলে কি তফাৎ ছিলো? নাৎসীদের হুবহু অনুকরণে তৎকালীন বাকশালী নেতাকর্মীদের শ্লোগান "এক নেতা এক দেশ; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ" ইত্যাদির চেয়ে চরম ফ্যাসিষ্ট অভিব্যক্তি কি আর কল্পনাও করা যায়? আর আপনারা যদি বলেন যে, সব দল নিষিদ্ধ করে দিয়ে এক দলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে, সব পত্রপত্রিকা বন্ধের মাধ্যমে মানুষের মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করে, এক ব্যক্তি এক দলের হাতে

www.icsbook.info

সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, 'এক নেতা এক দেশ' জাতীয় শ্লোগান ইত্যাদি তুলে সাচ্চা গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, তাহলে বলুন এগুলো হবসলক রুশো ভল্টেয়ার আব্রাহাম লিংকন রাসেল লাস্কি কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্র? আপনারা যে বলছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম ছিলো, তার মানে আপনাদের মতে বাকশালও ছিলো গণতান্ত্রিক। অথচ, ১৯৭৫-৯৬ সময়ের বহুদলীয় ব্যবস্থাকেও আপনারা বলছেন স্বৈরতন্ত্র। এর চেয়ে উদ্ভট অযৌক্তিক কথা আর কিছুই কি হতে পারে? আপনারা কি উপলব্ধি করেন যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক হলেও, যেকোন ফ্যাসিষ্ট স্বৈরতন্ত্রীর এই অমোঘ পরিণতি এড়ানো খুবই দুরুহ ব্যাপার? আপনারাই বলুন আজ কোথায় হিটলার কোথায় মুসোলিনী, কোথায় ইরানের শাহ, কোথায় নগোদিন দিয়েম, কোথায় মার্কোস, কোথায় নরিয়েগা, কোথায় ইদি আমিন, জুলফিকার আলী ভূট্টো? এঁদের সবাইই কি মর্মান্তিকভাবে মৃত্য এবং কিংবা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত নন? বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেইবা ইতিহাসের রায় পাল্টাবেন কেমন করে? কিন্তু কারা বঙ্গবন্ধুর এই পরিণতির জন্য দায়ী? কারা বঙ্গবন্ধুর কন্যাকেও নিতে চায় সেই একই ভয়ংকর পথে?

৪১. বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভারই একজন শীর্ষতম সদস্য এবং বাকশালের অন্যতম শীর্ষ নেতা।

১৯৭৫ এর নভেম্বর মাসে বিচারপতি সায়েম কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পার্লামেন্টই বহাল ছিল। খোন্দকার মোশতাকও ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দলেরই সদস্য, আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই দলের প্রথম কমিটিতে (১৯৪৯) বঙ্গবন্ধু ও তিনিই ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। তাঁর সরকারও ছিল সর্বাংশেই বঙ্গবন্ধুর দলেরই সরকার। খোন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভার কিংবা পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে যখন নিয়মিত বেতন ভাতা নিচ্ছিলেন, পতাকা শোভিত গাড়ী দৌড়াচ্ছিলেন, তখন কি আপনাদের বাস্তবিকই মনে পড়তো বঙ্গবন্ধুর কথা, বেগম মুজিবের কথা, তাঁর সন্তানদের কথা, শিশু শেখ রাসেলের কথা, শেখ ফজলুল হক মনির কথা? আপনাদের দলের অন্যতম প্রধান নেতা মহিউদ্দীন আহমদ স্বয়ং খোন্দকার মোশতাকের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতা পোদগর্নীর কাছে এবং সেখানে খোন্দকার মোশতাকের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২২ আগষ্ট আবদুল মালেক উকিল বিলাতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ পার্লামেন্টারি পার্টির কনফারেন্সে সরকারি দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "ফেরাউনের (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর) পতন হয়েছে।" কি আশ্চর্য নির্মম ধৃষ্টতা! অথচ, পরবর্তীকালে এই আবদুল মালেক উকিলকেই আপনারা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি। খোন্দকার

www.icsbook.info

মোশতাক কেবিনেটের অনেকে শেখ হাসিনার আমলেও এই দলের শীর্ষ নেতা ছিলেন। আসলে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আপনারা ভেবেছিলেন, খোন্দকার মোশতাক টিকে যাবেন এবং আপনারাও আমরণ ওজারতী এম, পি-গিরি ইত্যাদি চালিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। তাই ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই ১৯৭৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আপনারাই জারি করেছিলেন কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, (Ordinance No XIX of 1975) যাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হতে না পারে এবং আপনাদের মন্ত্রীত্ব এম.পি.গিরি ইত্যাদি বিঘ্নিত না হয়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী ও শীর্ষ আওয়ামী বাকশাল নেতা মনোরঞ্জন ধর নিজেই বলে গেছেন যে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যালের খসড়া তিনিই তৈরী করেছিলেন। তারপর, খোন্দকার মোশতাক উৎখাত হওয়ার পর আপনারা রাতারাতি গল্প তৈরী করলেন যে, আপনারা প্রাণের ভয়েই ওজারতী এম.পি.গিরি ইত্যাদি করেছিলেন। এখন জবাব দিন, আজ যাদের আপনারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলছেন, সেদিন কেন তাদের মন্ত্রিসভার যোগ দিয়েছিলেন? ভয়ে? আবদুল মালেক উকিলের কি ভয় ছিল লন্ডনে? মস্কোয় কি ভয় ছিল মহিউদ্দীন আহমদের? তারা যদি ফারুক রশীদের এতোই ভয় করতেন, তাহলে তারা লন্ডনে মস্কোয় থেকে গেলেন না কেন? থেকে গিয়ে সত্যকে বিদেশী প্রেসে তুলে ধরলেন না কেন? এতে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে ভয়ে বা অনুরূপ কোন কারণে নয়, স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহেই তাঁরা খোন্দকার মোশতাকের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন? আর যে বঙ্গবন্ধুর জন্য আপনাদের নেতৃত্ব-মন্ত্রীত্ব-সম্পদ, সেই বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদে ঝুকি না হয় একটু নিতেনই। তাঁরা যেখানে অকাতরে প্রাণ দিতে পারলেন, সেখানে আপনারা দুএকটা বুলেটের ঝুঁকিও নিতে পারলেন না কেন? এইইকি আপনাদের বঙ্গবন্ধু-ভক্তির নিদর্শন? নাকি, শুধু আপনাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহারের জন্যই বঙ্গবন্ধুর নামটুকু প্রয়োজন? ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স যে খারাপ-তা কি জারির সময় বুঝতে পারেননি? এসব কর্মকান্ড কি স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ও জাতির প্রতি চূড়ান্ততম বিশ্বাসঘাতকতা ও মোনাফেকি নয়?

৪২. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরবর্তী সময়ের ভূমিকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা সমালোচনা যাইই থাকুক না কেন, '৪৬ এর পাকিস্তান প্রশ্নে গণভোট, '৫২র ভাষা আন্দোলন, '৫৪র যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ষাটের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। এই বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশই কাটতে হয়েছিল কারা অন্তরালে। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাই এদেশের মানুষকে দিয়েছিল আঞ্চলিক স্বাধিকারের দিকনির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই সম্ভবপর হয়েছিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সেই

www.icsbook.info

ধ্বস নামানো বিজয়। বঙ্গবন্ধু না হলে এই বিজয় কখনই সম্ভবপর হতোনা, আর এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে না করলে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিই তখন সৃষ্টি হতো না। সুতরাং স্বাধীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদান ছিল ঐতিহাসিক ও অনন্যসাধারণ। একথাও অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি পরিকল্পনা করুন বা নাই করুন, তাঁর বিশাল ভাবমূর্তিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁর বিশাল ভাবমূর্তিই একাত্তুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল, তাজউদ্দিন-মোশতাকের বৈরীতা ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর নেতাদের বৈরীতা ইত্যাদিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, লক্ষ তরুণকে জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বাংলাদেশের নিপীড়িত আপামর জনগণকে সংগ্রামী প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং এরই সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী না হলেও, বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করে দেখার কোনই অবকাশ নেই। সুতরাং, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ব্যাপারে কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। দ্বিমত পোষণের কোনই সুযোগ নেই। তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করার বিচার হওয়ার প্রশ্নেও। সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন মানুষকেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও দলীয় নেতাদের হত্যা যেমন অপরাধ, ঠিক তেমনি অপরাধ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে হত্যা করাও। আপনাদের কি স্মরণ আছে যে, আপনাদের আমলেই হত্যা করা হয়েছিল শোষিত মানুষের মুক্তির বেদীমূলে নিবেদিতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে, জাসদের সহ সভাপতি এবং আওয়ামীলীগেরই সাবেক এমপিএ যশোরের এডভোকেট মোশাররফ হোসেনকে, মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক মাষ্টার, আবুল কালাম আজাদ, হাদী, মন্টু, রোকন, মীল মোস্তফা সহ হাজার হাজার জাসদ নেতাকর্মীদেরকে? এসব হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে থানাকে একটি মামলাও গ্রহণ করতে দেয়নি তৎকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। এসব হত্যাকান্ডের বিচারের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি? কেন আপনারা বিচার করেননি কর্নেল আবু তাহের বীরোত্তম, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তম, জেনারেল মঞ্জুর বীরোত্তমের হত্যাকান্ডের? নাকি আপনারা মনে করেন যে, শুধু আপনাদের দল ও গোষ্ঠীর লোকদের হত্যাকান্ডের বিচারই হওয়া উচিত? কিন্তু আপনাদের হাতে নিহতদের হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া একদম উচিত নয়? তাহলে কি ব্যাপারটা এই যে, আপনারা কাউকে হত্যা করলে সেটা বৈধ; কিন্তু আপনাদের কাউকে হত্যা করা হলে সেটা অবৈধ? কেউ যদি আপনাদের প্রশ্ন করে, সিরাজ সিকদার-মোশাররফ হোসেন, সিদ্দিক মাষ্টার-জিয়াউর রহমান প্রমুখের হত্যার বিচারের যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে বঙ্গবন্ধু, শেখ

www.icsbook.info

মনি, সৈয়দ নজরুলদের হত্যার বিচারেরইবা প্রয়োজন কি? তাহলে আপনারা কি জবাব দেবেন? ভালো কথা, ১৯৯৬-২০০১ সাল সময়মতো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকারই বাংলাদেশে দাপটের সঙ্গে কায়েম ছিলো। তাহলে কেন এই সরকার এ সকল রাজনৈতিক নেতা হত্যার বিচার করেনি? এর মধ্যেও কি কোন রহস্য বা তাৎপর্য লুকায়িত?

৪৩. ১৯৭১-এ যারা বাংলাদেশের মানুষ হয়েও বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করেছে, বাড়ীঘর লুট করেছে, ধর্ষণ করেছে তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিৎ ছিল। বিচার হচ্ছিল। কিন্তু স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই তাদের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আজ যদি আবার নতুন করে তাদের বিচার করতে হয়, তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিচারও অবশ্যই করতে হবে, যারা ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্র হনন করেছে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, লাইসেন্স পারমিটবাজী, রিলিফ চুরি, ভারতে সম্পদ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেরা সম্পদের পাহাড় বানিয়েছে এবং গোটা জাতিকে দু:সহ শোষণ ও দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, ৫০ 'হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার করেছে অথবা পাচারে সহায়তা করেছে, ভারতে পাট পাচার করে শুন্য গুদামে আগুন লাগিয়েছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, একদলীয় স্বৈরাচার কায়েমের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের জবরদস্তিমূলকভাবে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। যারা এসব কান্ড করেছে তাদের অপরাধ রাজাকার আলবদরদের তুলনায় কোন অংশে কম? কেন কম? আসুননা! আমরা একটা গণআদালত গঠন করে উভয় পর্যায়ের অপরাধীদের বিচার করি এবং তদন্ত করে দেখি কারা চৌদ্দ কোটি মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে? উভয় পর্যায়ের ঘাতক দালালদের বিচারে আপনারা রাজী আছেন কি? না থাকলে কেন নেই? গণআদালত প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্নের জবাব দিন। আজ যদি বি এন পি-র সমর্থকরা কিংবা জাতীয় পার্টি কিংবা ইসলামপন্থীরা আর একটা গণআদালত গঠন করে সমান সংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে সি আর দত্ত, শেখ হাসিনা, মোহাম্মদ নাসিম, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, শাহরিয়ার কবির, গাফফার চৌধুরী প্রমুখের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে দেয়, তাহলে কি হবে? আপনাদের গণআদালত-এর রায় কার্যকর করতে সরকার যদি বাধ্য থাকেন, তাহলে ওদের গণআদালত-এর রায় কার্যকর করতেও সরকার বাধ্য থাকবেন না কেন? আপনাদের যুক্তি কি? আর ১৯৯৬-২০০১ সময়ে যদি কারো বিরুদ্ধে হত্যা, সন্ত্রাস, গডফাদারী, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ সম্পদ আহরণ, বিদেশে প্রাসাদ নির্মাণ, দলবাজী, আদালতকে হুমকি প্রদান ইত্যাদির অভিযোগ

www.icsbook.info

থেকে থাকে, তাহলে বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টির অপরাধীদের পাশাপাশি এদের বিচারও কি একই সঙ্গে হয়ে যাওয়া উচিত নয়?

৪৪. আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরপরই ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে ধৃত ও পলাতক নির্বিশেষে সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হয়েছিল। (এসব অপরাধীদের কেউ কেউ পরে ধরা পড়ায় তাদের পূর্বঘোষিত শাস্তি ধরা পড়ার দিন থেকে কার্য্যকর করা হয়েছিল)। কিন্তু আপনারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত আপনাদের সে সুযোগই দেয়নি। ভারত ৯৩,০০০ জন যুদ্ধপরাধীকেই পাকিস্তানের কাছে প্রত্যার্পন করে দিয়েছিল। মূল অপরাধীদের কিছু করতে না পেরে আপনারা লাগলেন রাজাকার-আলবদরদের নিয়ে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, রাজাকার-আলবদর ধরার নামে আসলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাই চরিতার্থ করা হচ্ছে এবং নিরীহ লোকদেরই হয়রানি করা হচ্ছে, তখন স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই তাদের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত 'ভক্তরা' স্বাধীনতার দশকের পর দশক ধরে "রাজাকার-আলবদর' ইস্যুকে জিইয়ে রেখেছেন এবং 'গণ আদালত' বানিয়ে একজনকে ফাঁসির রায় পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। আপনারা কি জানেন, বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী পুলিশের কাছে খবর পৌছাতে দেরী হলে কিংবা কোন অভিযোগ দায়ের না করা হলেও প্রাপ্ত অভিযোগের প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সংশোধিত ১০ (ক) অনুচ্ছেদে যে ব্যতিক্রমধর্মী ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং অভিযোগ পেশ করার অনির্দিষ্ট সীমা নাকচ করে এই সুযোগ সীমিত করে দেন? বিচারপতি কে এম, সোবহান পরিচালিত 'লুৎফার মৃধা বনাম রাষ্ট্র' মামলার আদালত বলেন যে, পুলিশের কাছে অভিযোগ পেশ করার সময়সীমা ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার দেড় বছর পর দায়েরকৃত অভিযোগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যাখ্যা না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। উল্লেখিত মামলার অভিযুক্তকে মুক্তিদানের জন্য আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬)। যেখানে স্বাধীনতার দেড় বছর পর দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আপনারা স্বাধীনতার ২/৩ দশক পর ৭১ এর ঘাতক দালালদের (?) নির্মূল করার নামে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেন। এই "গণ আদালত" স্বাধীনতার এতো বছর পর কেন? ন্যুরেমবার্গের আদালতের মতো বিজয়ের পরপরই আপনারা আদালত গঠন করেননি কেন? "ঘাতক দালাল" দের বিরুদ্ধে তখনই মামলা দায়ের করে বিচারের মাধ্যমে রায় ঘোষণা করেননি কেন? নাকি 'ঘাতক দালাল' কারা সেটা তখন বুঝতে পারেননি? পরবর্তীতে গণভিত্তি হারিয়ে বারবার ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হওয়ার পরই সেটা বুঝতে পেরেছেন? নাকি পরিত্যক্ত সম্পত্তি-রিলিফ-পাট পাচার-

www.icsbook.info

লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদি নিয়ে আপনারা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে-সংবাদপত্রে-বিভিন্ন একাডেমিতে-অফিসে-আদালতে উচ্চতর পদ ভাগানো এবং ভাগ্যগড়ার কাছে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীরা অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিলেন বলে এদিকটায় তখন ঠিকমতো মনোযোগ দিয়ে উঠতে পারেননি? ১৯৯৫-২০০১ সালে তো আপনারা দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় ছিলেন। এবারও আপনারা, মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদাররা, রাজাকার আলবদরদের বিচার করলেননা কেন? কেন কার্যকর করলেননা অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কিত আপনাদের গণ আদালতের রায়? এর কারণ কি এ নয় যে ১৯৯৬ সালে আপনারা, মুক্তিযুদ্ধের সোল এজেন্টরা ওই গোলাম আযম এবং তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ সমর্থন সহযোগিতা ও মদদ নিয়েই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন? কিন্তু এখন কেন?

৪৫. আচ্ছা, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসবভনে তৎকালীন মূল্যে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের হীরা, মুক্তা, প্লাটিনাম ও সোনার অলংকার (বর্তমান মূল্য অন্তত ১০ গুণ বেশী) ইত্যাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত লাইসেন্সবিহীন ও অবৈধভাবে রক্ষিত অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো। ১ টি ভারী মেশিনগান, ২টি হাল্কা মেশিন গান, ৩টি এসএমজি, ৮টি ষ্টেনগান, ১০টি আধাস্বয়ংক্রীয় রাইফেল, ৬০টি গ্রেনেড ও প্রচুর গোলাবারুদ (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ অক্টোবর , ১৯৭৫)। ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বাধীন টীম কর্তৃক প্রাপ্ত এসব বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ সম্পর্কে আপনারা কি ব্যাখ্যা দেবেন?

৪৬. বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই, ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে পুণরায় বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যা আপনাদের ভাষায় স্বৈরতন্ত্র। এসময় সরকারের কাছে দরখাস্ত করে দল গঠনের অনুমতি নেওয়ার বিধান জারী করা হলে, আপনারা আপনাদের ভাষায় "স্বৈরাচারী" জিয়া সরকারের কাছে যথারীতি দরখাস্ত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন "বাকশাল" কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুণরায় আওয়ামী লীগ পূনরুজ্জীবিত করেন। প্রশ্ন হলো আপনারা "স্বৈরাচারী" জিয়া সরকারের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের লাইসেন্স নিলেন কেন? বঙ্গবন্ধুর শেষ স্বপ্ন বাকশালকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত আওয়ামী লীগইবা আবার গঠন করলেন কেন? ভয়ে? মেরুদণ্ডহীনতার কারণে? বাকশালের প্রতি নিষ্ঠাহীনতার কারণে? যে আবদুল মালেক উকিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডকে ফেরাউনের পতন বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই আবদুল মালেক উকিলকেইবা সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলেন কেন? কি যুক্তিতে প্রেসিডিয়ামে নিলেন মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখকে?

www.icsbook.info

৪৭. ১৯৭৫ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে (সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের ৪দিন আগে) বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফই (অন্য কেউ নয়) বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের হোতা ফারুক, রশীদ, ডালিম, শাহরিয়ারসহ সকলকে সহি সালামতে বিমান যোগে বিদেশে পাঠিয়ে দেন। ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে আওয়ামী লীগ পুণরুজ্জীবিত করে আপনারা পুর্ণোদ্যমে রাজনৈতিক কর্মকান্ডও শুরু করে দেন। ১৯৭৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী জিয়া সরকারের আমলে দূর্নীতির দায়ে আপনাদের অন্যতম নেতা খন্দকার মোশতাকের ৫ বছর কারাদণ্ড হয়ে যায়। অথচ, এমতাবস্থায় শেখ হাসিনা কেন বাংলাদেশে ছুটে এলেন না মর্মান্তিকভাবে নিহত তাঁর পিতা-মাতা-ভাইদের কবরটুকু অন্ততঃ জিয়ারত করতে? বঙ্গবন্ধুর খুনীদের কোন অস্তিত্বই তখন বাংলাদেশে না থাকা সত্বেও কেন শেখ হাসিনা ১৯৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ এমনকি ৮০' সালেও বাংলাদেশে এলেন না? পিতা-মাতা ভাইদের প্রতি শেখ হাসিনার এ কেমন ঋণ? এ কেমন দরদ? শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এলেন সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সুদীর্ঘ ৬ বছর পর, ১৯৮১ সালের ১৭ মে তারিখে। এর আগে বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে তিনি যদি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে থাকেন, তাহলে ১৯৮১ সালেই বা তিনি নিরাপত্তা বোধ করলেন কি কারণে? কে তাঁকে এ সময় দিলো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা? শেখ হাসিনার বাংলাদেশে আগমনের ঠিক ১৪ দিন পরই (৩১মে) প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রামে নিহত হলেন। শেখ হাসিনার আগমন ও তার ১৪ দিন পর জিয়া হত্যা কি নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার? যতি তাইই হয়, তাহলে জিয়া হত্যার পরপর শেখ হাসিনা আগরতলা দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কেন? জিয়া হত্যা ও তাঁর ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কি একেবারেই সম্পর্কহীন বিষয়? এই প্রসঙ্গে মতিউর রহমান রেন্টুর বক্তব্য কি একেবারেই মিথ্যে?

৪৮. ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাদখল করলে আপনারা দৃশ্যতঃই খুবই উৎফুল্ল হন। কিন্তু ৩/৪ বছরের মধ্যেই আপনারা বুঝতে পারেন যে, এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার বা ক্ষমতা ভাগাভাগি করার আদৌ কোন পাত্র নন। অতএব, এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা ব্যতীত শেষ পর্যন্ত আপনাদের আর কোন গত্যান্তরই থাকে না। বিএনপিতো প্রথম থেকেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে আসছিলো। ফলে, আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে আপনারা বিএনপির সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচী দিতে শুরু করেন। নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও হালাল করার উদ্দেশ্যে এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তার নিজস্ব দল জাতীয় পার্টি গঠন করেন এবং ১৯ মে এক উদ্দেশ্যমূলক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আওয়ামীলীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন উভয় জোটই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, যারা এরশাদের নির্বাচনে অংশ নেবে,

www.icsbook.info

তারাই জাতীয় বেঈমান হিসাবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু ঢাকায় ফিরে এসেই পরদিন (২২ মার্চ, ১৯৮৬) আন্দোলনের সহযোগিদের সঙ্গে কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেই শেখ হাসিনা আকস্মিকভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণও করেন। অন্যদিকে বিএনপি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচন বর্জনে অনড় থাকেন। এই সময়ে আওয়ামীলীগও যদি এই নির্বাচন যুগপৎ বর্জন করতো, তাহলে নির্বাচন একেবারেই প্রহসনে পরিণত হতো এবং স্বৈরচারী এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠতো। এমতাবস্থায় শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে বর্ধিত জীবন (Lease of life) প্রদান করে। এই যে, যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে তারাই জাতীয় বেঈমান হিসাবে চিহ্নিত হবে বলে ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা নিজেই পরদিন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন, এতে শেখ হাসিনার নিজেরই সংজ্ঞা অনুযায়ী শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগকে কি বলে চিহ্নিত করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন? স্বৈরাচারী এরশাদকে লীজ অব লাইফ দেওয়ার ব্যাপারেই বা আপনাদের কি ব্যাখ্যা?

৪৯. যাইই হোক, এরশাদের সঙ্গে আপনাদের রাজনৈতিক হানিমুন অবশ্য খুব একটা সুখপ্রদ হয়নি। ফলে ২/৩ বছরের মধ্যেই আপনারা আবার আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং ১৯৯০ সালে ৭ দফার ভিত্তিতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের পাশাপাশি চলতে থাকে আপনাদের ৮ দলীয় জোটের আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ৪ ডিসেম্বর (১৯৯০) এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ অনুষ্ঠিত হয় জাতির ইতিহাসের প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এই নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, বিএনপি পেয়েছে ১৪০টি আসন এবং আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৮৪টি আসন। বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫টিতেই বিজয়ী হয়েছেন, আর শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২টিতেই পরাজিত হয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই শেখ হাসিনা বলতেই থাকেন যে, সুক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমেই নাকি তাঁদেরকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনার এই অভিযোগ কি সত্য ছিলো? পৃথিবীর কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা পর্যবেক্ষকই কি এই সূক্ষ্ম কারচুপির তত্ব মেনে নিয়েছিলো? বরং সত্য কি ছিলোনা যে সাংগঠনিক দিক থেকে আওয়ামীলীগ বিএনপির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্বেও আওয়ামীলীগ হেরে গিয়েছিলে প্রধানতঃ আওয়ামীলীগের আচরণ ও শেখ হাসিনার অতি প্রতিহিংসামূলক অশ্লীল অশালীন কথাবার্তা ও আচার আচরণের দরুণ, যা সাধারণ মানুষ আদৌ পছন্দ করেনি? শেখ হাসিনার নির্বাচন পূর্ব টেলিভিশন ভাষণই কি জনগণকে বাধ্য করেনি তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.icsbook.info

করতে? অথচ তার পরও আওয়ামী নেতাবুদ্ধিজীবীরা কি শেখ হাসিনাকে প্রতিনিয়ত আরো উস্কানি দেননি আরো বেশি মুখরা, অশালীন, অশ্লীল ও জিঘাংসাপরায়ন আচরণ করতে? এখনো দিচ্ছেন না? এবং এভাবেই নষ্ট করছেন না নেত্রীর ভাবমূর্তি?

৫০. ১৯৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি প্রাথমিক ভাবে ১৪০টি আসন পেলেও তাদের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিলোনা বিধায় তাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর সহায়তা নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়। অত:পর, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় আওয়ামীলীগ মনোনয়ন দেয় সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। এসময় আপনারা আপনাদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামায়াতের তদানীন্তন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে প্রেরণ করেন তাঁর সমর্থন ও অনুকম্পা ভিক্ষার জন্য। কিন্তু জামায়াত আপনাদের বদলে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন দিলেই আপনারা ক্ষেপে যান এবং গঠন করেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক)। ১৯৫২ সালে তথাকথিত "গণ আদালত" গঠন করে অধ্যাপক গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন। প্রশ্ন হলো "ঘাতক-দালাল" অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছেই আপনারা আপনাদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কৃপা-ভিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন কেন? তখন কি আপনারা জানতেন না যে অধ্যাপক গোলাম আযম একজন ঘাতক দালাল ও অনাগরিক"? আচ্ছা, গোলাম আযম যদি আপনাদের প্রার্থনা মোতাবেক আপনাদের মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে দিতেন, তাহলে কি আপনারা কখনোই তাঁর বিচারের জন্য তথা কথিত "গণ আদালত" গঠন করতেন? প্রদান করতেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড? আপনাদের পরবর্তী ভূমিকা কি প্রমাণ করে?

৫১. ১৯৯১-৯৬ সময়ের বিএনপি সরকারের আমলে শেখ হাসিনা পার্লামেন্টের মধ্যেই ঘোষণা করেন যে, তাঁরা বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবেন না। এজন্য, শেখ হাসিনা ও আপনারা লাগাতার পার্লামেন্ট বর্জন, বাংলাদেশকে সাহায্য না দেওয়ার জন্য দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের কাছে ধর্না প্রদানসহ যতোভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের বেল্টের নীচে আঘাত হানা সম্ভব, তাই করতে কখনোই কোন কার্পণ্য করেননি। এসময় আপনারা সর্বমোট ১৭৩ দিন হরতাল করেন। হরতালে কল কারখানা বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, অফিস আদালতের অচলাবস্থা, উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত করণ, যানবাহন বন্ধ, রফতানী ও বন্দর কার্যক্রম বন্ধ ইত্যাদি কারণে দৈনিক জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ যদি মাত্র ৫০০ কোটি টাকাও ধরা হয়, তাহলে ১৭৩ দিন হরতাল করে আপনারা জাতির ক্ষতি সাধন করেন ১৭৩×৫০০=৮৬৫০০ কোটি টাকা পরিমাণ। আপনারা কি সুনিশ্চিত যে, আপনাদের দ্বারা জাতির ৮৬৫০০ কোটি টাকা পরিমাণ ক্ষতি সাধন জাতির জন্য খুবই কল্যাণকর

www.icsbook.info

হয়েছে? আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ যদি বাস্তবিকই ঋণ-সাহায্যাদি বন্ধ করে দিতো, তাহলে দুর্ভোগটা কি খালেদা জিয়াদের হতো, নাকি তা হতো বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের? আপনারা কি বলবেন যে জাতির এইরূপ ক্ষতিসাধনও ঋণ সাহায্য বন্ধের মাধ্যমে ওই সময় করা ১২/১৩ কোটি মানুষকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেওয়ার প্রাণপন প্রয়াস ইত্যাদিই হলো দেশপ্রেম? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? এবং জনগণের প্রতি মমতা? আপনারা তো দাবী করে থাকেন যে, আপনারাই একমাত্র গণতন্ত্রী এবং আর সবাই স্বৈরতন্ত্রী। পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন গণতান্ত্রিক দল এভাবে হরতাল করেছে এবং জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে, তেমন একটি মাত্র নজীরও আপনারা দেখাতে সমর্থ হবেন কি?

৫১. ১৯৯৩ সালের দিকে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্কে চিড় ধরে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এসময় আওয়ামী লীগ খালেদা জিয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করলো তাদেরই "গণ আদালত" কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের ভাষায় "স্বৈরাচারী" হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে একাট্টা হয়ে। জামায়াত আপনাদের সঙ্গে মিলে যখন খালেদা জিয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন করেন, তখন কি অধ্যাপক গোলাম আযমদের "রাজাকারত্ব" লোপ পেয়ে গিয়েছিলো? লোপ পেয়ে গিয়েছিলো হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের "স্বৈরাচারীত্ব"? তাহলে, ব্যাপার কি এই যে, জামায়াত বা এরশাদের জাতীয় পার্টি যখন আওয়ামীলীগের পক্ষে থাকে, তখন আর "ঘাতক-দালাল", "রাজাকার-আলবদর" কিংবা "স্বৈরাচার" থাকে না; কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে চলে যায়, অমনি তারা আবার ঘাতক-দালাল, রাজাকার-আলবদর বা স্বৈরাচারে পর্যবসিত হয়ে যায়? সত্যিই কি আশ্চর্য আপনাদের সংজ্ঞা! কি আশ্চর্য আপনাদের লজিক! নয় কি?

৫২. ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম থেকেই আপনারা শুরু করেন হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ ইত্যাদির তান্ডব। এরই এক পর্যায়ে ঢাকার তদানীন্তন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়ে নির্মাণ করেন "জনতার মঞ্চ" নামক এক বিশাল বক্তৃতার মঞ্চ। এসময় বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন সচিব মহিউদ্দীন খান আলমগীর সরকারি বেতনভূক্ত কর্মচারী থাকা অবস্থায়ই তাঁর অনুগত শফিউর রহমান (পাট সচিব), ফারুক সোবহান (পররাষ্ট্র সচিব), সৈয়দ আহমদ (প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব), ওয়ালিউল ইসলাম (রেল সচিব), আলমগীর ফারুক চৌধুরী (স্থানীয় সরকার সচিব), প্রমুখ সরকারি আমলাদের নিয়ে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন, 'জনতার মঞ্চে' উঠে সরকারের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী ভাষণের পর ভাষণ দিতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে মন্ত্রীদের সচিবালয়ে প্রবেশই বন্ধ করে দেন। আপনারা কি

www.icsbook.info

সুনিশ্চিত যে সরকারি আমলাদের আচরণ বিধি ও শপথ পদদলিত করে মহিউদ্দিন খান আলমগীররা যে সরকারি কর্মরত অবস্থায়ই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং বিরোধী দলের মঞ্চে উঠে ও সরকারের মন্ত্রীদের স্বস্ব অফিসে ঢুকতে না দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক দলবাজীতে লিপ্ত হলেন, এতে রাষ্ট্র ও জাতির খুবই কল্যাণ সাধিত হয়েছে? এই যে সরকারি প্রশাসনকে আপনারা আওয়ামী লীগার ও অ-আওয়ামী লীগার-এই দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে ভাগ করে গেলেন এবং চালু করে গেলেন 'স্পয়েল সিষ্টেম', এতে প্রশাসনের সততা নিরপেক্ষতা ও কার্যকারীতা কি সম্পূর্ণই ধ্বংস হয়ে যায়নি? আপনারা, আওয়ামীলীগাররা, মহিউদ্দিন খান আলমগীরদের এই দলবাজীর দরুণ তাৎক্ষণিক একটা বেনিফিট পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা কি শেষ পর্যন্ত আপনাদের নিজেদের জন্যও কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে? ২০০১ পরবর্তী ঘটনাবলী কি প্রমাণ করে? পরবর্তী খালেদা জিয়া সরকারের আমলে (২০০১-০৬) আপনাদের মুদ্রায়ই যে আপনাদের পেমেন্ট করা হয়, সেটা আপনাদের কেমন লাগে?

৫৪. এটা সকলেই জানেন যে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক ধারায় নির্বাচনটা হয় প্রধানতঃ নেতিবাচক; অর্থাৎ জনগণ আওয়ামী পক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপি পক্ষকে ভোট দেয়; আবার বিএনপি পক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী পক্ষকে ভোট দেয়। কোন পক্ষের আদর্শ কর্মসূচী বা নেতৃত্বের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে ভোট দেয়না। ১৯৯১-৯৬ সালে বিএনপি সরকার জনগণের আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায়, যথারীতি নেতিবাচক কারণেই ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ বিএনপির চেয়ে বেশি আসন পেয়ে যায়। কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আওয়ামী লীগেরও প্রয়োজন হয় অন্যান্য দলের সহায়তার। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে তাদের ভাষায় 'রাজাকার' জামায়াতে ইসলামী, "স্বৈরাচারী' এরশাদের জাতীয় দল এবং প্রকাশ্য জনসভায় বঙ্গবন্ধুর চামড়া তুলে লবন লাগিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্তকারী আসম আবদুর রবের সহায়তায়। জামায়াত অবশ্য আওয়ামীলীগকে সরকার গঠনে সমর্থন দিলেও, মন্ত্রীসভার অন্তর্ভূক্ত হয়না। কিন্তু বাকী দু'দলকে সঙ্গে নিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হয় "ঐক্যমতের সরকার" তাহলে এই সময়টায় কি জামায়াত নেতারা 'ঘাতক-দালাল' এবং এরশাদ-মঞ্জুরা "স্বৈরাচারী ছিলেননা? আরো লক্ষ্যণীয়, ১৯৯২ সালে আওয়ামী ঘাদানিকরা অধ্যাপক গোলাম আযমের ফাঁসির রায় দিলেও, ১৯৯৩ সাল থেকে খালেদা জিয়া সরকার বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী-জামায়াত সমঝোতা হয়ে যাওয়ায় এই আওয়ামীলীগাররা, ঘাদানিকের নেতারা কিংবা আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরাই এই সময়ে গোলাম আযম বা জামায়াতের বিরুদ্ধে একটি শব্দও আর উচ্চারণ করেননি। বরং স্বয়ং শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আওয়ামী নেতারা জামায়াত নেতাদের সঙ্গে অসংখ্য

www.icsbook.info

বৈঠক করেছেন, পরামর্শ করেছেন, খানাপিনা করেছেন এবং একই কর্মসূচী দিয়ে কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে খালেদা বিরোধী আন্দোলন করেছেন। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ঐক্যমতের সরকার (যা আসলে সর্বাংশেই আওয়ামী লীগ সরকার) ক্ষমতায় ছিলো। কিন্তু এই পাঁচ বছর, বিশেষতঃ প্রথম ৩/৪ বছর ঘাদানিকরা গোলাম আযমের ফাঁসির ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্চই করেননি। তথাকথিত গণআদালতের মাধ্যমে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় যদি একটি অসৎ ও বোগাস ব্যাপারই না হয়ে থাকে, তাহলে ঘাদানিকরা গোলাম আযমের ফাঁসির রায় শেখ হাসিনা সরকারকে দিয়েই কার্যকর করিয়ে নেননি কেন? এর কারণ কি তথাকথিত গণ আদালত ও তার রায়ের ভিত্তিহীনতা? নাকি বিএনপি সরকারের পতন ঘটানো ও ১৯৯৬-এ সরকার গঠনে আওয়ামীলীগকে জামায়াত কর্তৃক মদদ দান জনিত কৃতজ্ঞতাবোধ?

৫৫. যাইই হোক ১৯৯৬-২০০১ সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যমতের সরকার (আসলে আওয়ামীলীগ সরকারই) ক্ষমতায় ছিলো। এই পাঁচ বছরে এই সরকারের প্রধান অর্জনসমূহ ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপঃ

ক. এসময়ে শেয়ার বাজারে ভয়ংকর ধ্বস নামে। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৩৭০০ থেকে ৫০০-এর কোঠায় নেমে আসে।

খ. বিদেশী বিনিয়োগের হার প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে যায়। দেশী বিনিয়োগও হয় অকিঞ্চিৎকর।

গ. টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয় ১৮ বার ।

ঘ. সরকারের শেষের দিকে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ১০০ কোটি ডলারেরও নীচে নেমে যায়।

ঙ. সাবমেরিন অপটিক ফাইবার লাইনের সঙ্গে সংযোগ নেওয়া হয় না, ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ((ICT)-এর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে না।

চ. খুন-ধর্ষণ-ছিনতাই-চাঁদাবাজী সহ সর্বপ্রকার ক্রাইম সর্বকালের সর্ব রেকর্ড অতিক্রম করে যায়। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীই প্রকাশ্য সমর্থন ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করেন সরকার দলীয় নরদানবদের। দলীয় মন্ত্রী নেতাদের পুত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডও বেপরোয়া পর্যায়ে উপনীত হয়।

ছ. স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উচ্চ আদালতের বিচারকদের লাঠি মারার প্রকাশ্য হুমকি দেন। অশালীন ও লাগামহীন বক্তব্যের জন্য উচ্চ আদালত দু'দুবার স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীকেই সতর্ক করে দিতে বাধ্য হন, যা নজীরবিহীন। একবারতো আদালত সরকারকে জরিমানা করে দিতেও বাধ্য হন।

জ. পুলিশী ঘুষ-দূর্নীতি-চাঁদাবাজী ও দৌরাত্ম্যও সীমাহীন পর্যায়ে উপনীত হয়।

www.icsbook.info

ঝ. রাষ্ট্রীয় খরচে শেখ হাসিনা ১১টি অনারারী ডক্টরেট সংগ্রহ করেন, যদিও চার্চিল, জওহর লাল নেহরু বা কেনেডীর মতো মানুষরা একটি মাত্র অনারারী ডক্টরেট যোগাড়েরও কখনো চেষ্টা করেননি। এটা অনেকের কাছে স্থূল বালখিল্যতা বলে গণ্য হয়।

ঞ. প্রায় ১০ হাজার প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ বঙ্গবন্ধু বা তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে করা হয়। অনেক পুরানো প্রতিষ্ঠানের নামও একইভাবে বদলে দেওয়া হয়।

ট. শিক্ষা ক্ষেত্রে এসময়ে নকল, নোট বই, প্রাইভেট টিউশনী ইত্যাদির তান্ডব অতি ভয়ংকর আকার ধারণ করে।

ঠ. এই পাঁচ বছরে আওয়ামী মন্ত্রী-এমপি-নেতাদের অর্থসম্পদ আহরণের বিষয়টি কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌছে যায়। পত্রপত্রিকায় সংবাদ বেরোয় যে অসংখ্য আওয়ামী নেতা ইউরোপ-আমেরিকায় বিলাসবহুল বাড়ীর অধিকারী হয়েছেন। বিদেশী ব্যাংকে বিশাল ব্যাংক ব্যালেন্সতো গড়েছেনই। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামীতে স্বয়ং শেখ হাসিনার রাজপ্রসাদতুল্য বাড়ীর বিবরণও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ড. শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, শুধুমাত্র এই দুই বোনের নিরপত্তার জন্যই একটি আইন পাস করানো হয়। এই নিরাপত্তা আইন কার্যকর থাকলে এই ২ জন ব্যক্তির জন্য প্রতি বছর জাতির প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা ছিলো।

ঢ. শেখ হাসিনার নামে রাষ্ট্রীয় ভবন 'গণভবন' বরাদ্দ দেওয়া হয়। এটা কোন সাবেক মার্কিন সরকার প্রধানের নামে হোয়াইট হাউস কিংবা সাবেক রুশ সরকার প্রধানের নামে ক্রেমলীন বরাদ্দ দেওয়ার সমতুল্য। এটাও দুনিয়ার ইতিহাসে নজীর বিহীন, অকল্পনীয়।

ণ. সেনাবাহিনী-আমলা-পুলিশদের দলীয়করণ করা হয়। ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি ডিসি, এসপি, টিএনও, ওসিসহ আমলা ও পুলিশের সকল গুরুত্বপূর্ণপদে যাতে আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগতরাই নিয়োজিত থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

ত. শেখ হাসিনা সরকারের এই পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ বিশ্বের ১ নং দূর্নীতিবাজ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

থ. এই সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাও পৃথিবীর ১নং নোংরা ও পরিবেশ দূষিত শহর হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আপনারা বলতেন যে, যে একুশ বছর আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন না, সেই সময়কার শাসকরা শুধু জঞ্জালই জমিয়েছে এবং আপনারা তা পরিস্কার করার মহৎ ও সুকঠিন কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাহলে, উপরোক্ত কাজ সমূহই কি আপনাদের ২১ বছরের

www.icsbook.info

জঞ্জাল পরিস্কারের নমুনা? আপনারা দাবী করেন, ১৯৯৬-২০০১ সময়ে বাংলাদেশের যে উন্নতি হয়েছে, তা তৎপূর্ববর্তী ২১ বছরের উন্নয়নের তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি। শেয়ার বাজারের ধ্বস থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিশ্বের ১নং দুর্নীতিবাজ ও অন্যতম দরিদ্রতম দেশে পরিণত হওয়াই কি আপনাদের অতুলনীয় বিস্ময়কর উন্নয়ন ও সাফল্যের প্রমাণ? খুবই আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?

৫৬. আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক এবং শেখ হাসিনার পিতৃব্যতূল্য। জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়েই এই জিল্লুর রহমান শেখ হাসিনা সম্পর্কে বলেন, "শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই সক্রেটিস, মহাত্মা গান্ধী ও মাদার তেরেসার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন।" কিন্তু সক্রেটিস, গান্ধী ও মাদার তেরেসা তিন জন তো তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব? শেখ হাসিনা একই সঙ্গে এই তিন জনের সমকক্ষ হয়ে গেলেন কিভাবে? শেখ হাসিনা কি সত্যিই সক্রেটিসের মতো মহা দার্শনিক? তাঁর দর্শনের কোন বইপত্র কি বেরিয়েছে? শেখ হাসিনার জীবনধারা (Life-style) চালচলন ত্যাগ ও মানবসেবা কি মাদার তেরেসার সমতূল্য? তিনি কি গান্ধীর মতো বিলাস বর্জিত মেধাবী? এ ধরনের বক্তব্য যাঁরা দেন এবং এধরনের বক্তব্য শুনতে যারা ভালোবাসেন, তাঁদের মূল্যায়ন কি হওয়া উচিত?

৫৭. শেখ হাসিনা সরকারই রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ প্রদান, তথা নির্বাচিত করেছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে, এই বিবেচনায় যে তিনি আওয়ামী চিন্তাধারাই মানুষ। একই বিবেচনায় শেখ হাসিনারা এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, যাতে ইসলামনিষ্ঠ বিচারপতি মোস্তফা কামালের পরিবর্তে আওয়ামী চিন্তাধারার কাছাকাছি বিচারপতি লতিফুর রহমানই কেয়ার টেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে পারেন। আওয়ামী লীগের প্রতি একান্ত অনুগত থাকবেন, এই বিবেচনায়ই তদানীন্তন বিরোধি দলের বিরোধিতার মুখেও এম. এ. সাঈদকে তাঁরা নিয়োগ করেছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এই তিন ব্যক্তিত্ব কোন বিবেচনায়ই বিএনপি পন্থী বা তথাকথিত মৌলবাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন না। কিন্তু তিনজনই ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বিবেকবান মানুষ। বিবেকের কারণেই এই তিন ব্যক্তিত্ব বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন ২০০১ সালের নির্বাচন সম্পূর্ন অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠান করবেন বলে। অপরদিকে, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হারুন-উর-রশিদও তাঁর বাহিনীকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যাপারে মজবুত থাকেন। ফলে, আমলাতন্ত্র ও পুলিশকে দলীয় ক্যাডার হিসাবে ব্যবহারের জন্য আপনাদের প্রণীত নীলনক্সা প্রায় পুরোপুরিই ভেস্তে যায়। দলীয় গডফাদার ও ক্যাডারদের বেপরোয়া তান্ডবের সুবিধাও হয়ে যায় অন্তর্হিত। সম্ভবপর হয়না জালভোটের দৌরাত্মা, নির্বাচনী ফলাফল হাইজ্যাক বা মিডিয়া ক্যু দেশী-বিদেশী প্রতিটি (আবার বলছি, প্রতিটি) পর্যবেক্ষকই একবাক্যে

www.icsbook.info

স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচন ছিলো সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ। অনেকে একথাও বলেন যে, বাংলাদেশের এই নির্বাচন ছিলো তৃতীয় বিশ্বের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দেশবিদেশের একজন পর্যবেক্ষকও এই নির্বাচনে কোন পক্ষপাতিত্ব বা ঘাপলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেননি। স্বয়ং শেখ হাসিনাও নির্বাচনের দিন মন্তব্য করেন যে নির্বাচন সুষ্ঠুই হচ্ছে। কিন্তু যেই নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হতে শুরু করে এবং স্পষ্ট হতে থাকে যে বিএনপি জোট বিপুল বিজয় অর্জন করতে যাচ্ছে, অমনি শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগারদের সুর পাল্টে যায়। শেখ হাসিনারা বলতে শুরু করেন "সুক্ষ্ম ও স্থুল কারচুপির মাধ্যমে আমাদেরকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে", "বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, বিচারপতি লতিফুর রহমান ও এম.এ.সাঈদ বিএনপির সঙ্গে চক্রান্ত করে আওয়ামীলীগের নিশ্চিত বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়েছে", "এই তিন ব্যক্তিকে শেখ হাসিনা নিয়োগ দিয়েছিলেন আওয়ামী স্বার্থরক্ষার বেড়া হিসাবে, কিন্তু এই বেড়াই শেখ হাসিনার ক্ষেত খেয়ে ফেলেছে", "চার দলীয় জোট প্লাস বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, বিচারপতি লতিফুর রহমান ও এম.এ.সাঈদ এই ৭ দলীয় জোটই নীলনক্সার মাধ্যমে আওয়ামীলীগকে জোর করে পরাজিত করেছে" ইত্যাদি। কিন্তু দেশবিদেশের কোন একটি পর্যবেক্ষক বা সংস্থা বা দূতাবাসও কি শেখ হাসিনাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন? এরকম একটি মাত্র উদাহরণ কি কেউ দেখাতে পারবেন? দুনিয়ার কোন মানুষই কোন উদ্দেশ্য (Motive) ছাড়া কোন কাজ করেন না। আওয়ামীলীগ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি, কেয়ার টেকার সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার কি উদ্দেশ্যে বা কোন স্বার্থে বিএনপির সঙ্গে চক্রান্ত করে আওয়ামীলীগকে হারিয়ে দিতে চাইলেন? আওয়ামীলীগকে হারিয়ে দিয়ে এই তিন ব্যক্তি কি কোন ভাবেই লাভবান হয়েছেন? যে আওয়ামীলীগ তাঁদেরকে পরম সন্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, সেই আওয়ামীলীগকে তাঁরা কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধু শুধুই হারিয়ে দিতে চাইবেন, এটা কি কোন উন্মাদের পক্ষেও বিশ্বাসযোগ্য? আসলে ব্যাপারটা কি এ নয় যে, আওয়ামী নেতা-ক্যাডার-বুদ্ধিজীবীদের মতে অন্ধ ও মারমুখী দলবাজীটাই হলো নিরপেক্ষতা? সত্যিকার নিরপেক্ষতায় আওয়ামীলীগ একচ্ছত্র ভাবে লাভবান হয়না বিধায়, তা তাঁদের বিচারে আওয়ামী বিরোধিতারই সামিল? এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রতি আওয়ামীলীগারদেরও ক্ষোভের কারণ কি এই নয় যে, আওয়ামীলীগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েও কেন তারা আওয়ামী নীল নক্সাকে বাস্তবায়িত হতে দিলেননা? কেন তাঁরা সরাসরি মাঠে নেমে যে কোন মূল্যে আওয়ামী লীগকে জেতালেন না? কেন তাঁরা নিরপেক্ষ হতে গেলেন, বিশেষতঃ নিরপেক্ষতা যখন আওয়ামী লীগের স্বার্থের বিরোধী? ২০০১ সালের নির্বাচন ও তিন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এধরনের উদ্ভট প্রতিহিংসাপরায়ণ বিষোদগার করে

www.icsbook.info

আপনারা কি কোন কিছুই অর্জন করতে পেরেছেন? দেশের সব সন্মানিত ব্যক্তিত্বের পক্ষে কি সম্ভব মহিউদ্দীন খান আলমগীরের মতো ভূমিকা পালন করা?

৫৮. ২০০১-এর নির্বাচনে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা সিদ্ধান্ত নেন যে, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের জন্য আর অপেক্ষা করা যাবেনা, যে প্রকারেই হোকনা কেন, এখনই বিএনপি জোট সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে ফেলতেই হবে। এজন্য আপনারা তড়িৎ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন:

ক. নির্বাচনের পরপরই আপনারা ঘোষণা করলেন যে আপনারা শপথও নেবেন না, পার্লামেন্টেও যাবেন না। কিন্তু যখনই দেখলেন যে, জোট সরকার আপনাদের অনুপস্থিতিকে কোন পাত্তাই দিচ্ছেনা, তখন না-সাধা সত্বেও আপনারা শপথও নিলেন এবং পার্লামেন্টেও যেতে থাকলেন: হৈচৈ করেও যখন তখন ওয়াক আউট করে সংবাদ শিরোনাম হবার কৌশল অবলম্বন করলেন।

খ.ক্ষমতায় থাকতে শেখ হাসিনা একাধিকবার অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা বিরোধী দলে গেলেও আর কখনোই হরতাল করবেন না। কিন্তু তিনি যথারীতি তাঁদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে একের পর এক হরতাল দিতেই থাকলেন।

গ. আওয়ামী নেতা বুদ্ধিজীবীরা জোট সরকারের যে কোন কাজ, সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগের দন্তনখরে বিরোধিতা করতে থাকলেন। এমনকি সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দমনের লক্ষ্যে পরিচালিত অপারেশন ক্লিনহার্ট শীর্ষক জননন্দিত যৌথ অভিযানের বিরুদ্ধেও দেশেবিদেশে ভয়ংকর প্রচারণা চালাতে শুরু করলেন।

ঘ. মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও ইজরায়েলের এরিয়েল শ্যারণ মুসলমানদেরকে ঢালাওভাবে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করতে উদ্যত হলে এবং আফগানিস্তানে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তালেবানদের উচ্ছেদ করে হামিদ কারজাইকে ধরে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলে আপনারা হয়তো খুবই উজ্জীবিত হন। আপনারা ভাবতে থাকেন যে, বাংলাদেশেও তালেবান, আলকায়েদা, হরকাতুল জ্বিহাদ প্রমুখের তান্ডব চলছে, বিএনপি জোট সরকার এদের মদদ দিচ্ছে, এমনকি জোট সরকারের মধ্যেও মৌলবাদী সন্ত্রাসী রয়েছে ইত্যাদি কথা জোরেশোরে প্রচার করলে বুশব্লেয়াররা বাংলাদেশের সশস্ত্র হামলা চালাবে এবং জোট সরকারকে উচ্ছেদ করে দিয়ে আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, ঠিক যেভাবে তাঁরা হামিদ কারজাইকে বসিয়ে দিয়েছে। শুরু হয় এ লাইনে আপনাদের ভয়ংকর প্রয়াস।

ঙ. কাশ্মীর ও ভারতের গুজরাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম হত্যাযজ্ঞ দেখেও সম্ভবত: আপনারা খুবই অনুপ্রাণিত হন। আপনারা হয়তো মনে

www.icsbook.info

করেন যে, বাংলাদেশের বিএনপি জোট সরকারের আমলে হিন্দুদের কচুকাটা করা হচ্ছে এবং হিন্দুদের ওপর ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন চালানো হচ্ছে, ইত্যাদি কথা যদি ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায়, তাহলে ভারতও বাংলাদেশ আক্রমণ করে জোট সরকারকে হটিয়ে শেখ হাসিনা বা আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারে। অতএব, আপনারা শুরু করেন বাংলাদেশে হিন্দু হত্যানিপীড়নের ভয়ংকর কল্পকাহিনী প্রচার। বেপরোয়া হয়ে যান বাংলাদেশকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বলে প্রমাণ করার জন্য এক্ষেত্রেও আপনারা অর্জন করেন এক ধরনের সাফল্য। ২০০২ সালের শেষের দিকে ভারত সরকার ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা শেখ হাসিনাকে দিল্লীতে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে এটা প্রায় স্পষ্টই করে দেন যে রাংলাদেশে শেখ হাসিনাই তাঁদের লোক এবং আওয়ামীলীগই তাঁদের দল।

চ. আপনারা, বিশেষতঃ আপনাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিভিন্ন সংস্থা, ফোরাম, সরকার, পার্লামেন্ট, সংস্থা প্রভৃতির কাছে বিএনপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে নালিশের পর নালিশ দিতে থাকেন। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহকে এই মর্মে বাধ্য করার চেষ্টা করতেই থাকেন, যাতে তারা বাংলাদেশকে প্রদেয় ঋণ-সাহায্যাদি বন্ধ করে দেয় এবং ফলে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতো তথ্যবিপ্লবের দুনিয়া। বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ভারতসহ সবারই রয়েছে সুসংঠিত গোয়েন্দা ও তথ নেটওয়ার্ক, এমনকি স্যাটেলাইট সার্ভাইলেন্স সিস্টেমও। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নেই। ঢাকাস্থ তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরী অ্যান পিটার্সতো আওয়ামীলীগারদের সমস্ত প্রচারণাকে কার্যতঃ নাকচই করে দিয়ে বলে ছিলেন যে, বাংলাদেশ একটি উদার মুসলিম দেশ, এদেশে আলকায়েদা তৎপরতা সম্পর্কে দূতাবাসের কাছে কোনই প্রমাণ নেই এবং সাংবাদিক অ্যালেক্স পেরী বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামী মৌলবাদী তৎপরতারও রয়েছে হাজার একটা নিজস্ব কোর্স। তারা কি জানেন বাংলাদেশে বাস্তবিকই কি ঘটছে? ফলে আপনাদের প্রতি যতো পক্ষপাতিত্বই থাকনা কেন, আপনারা উস্কানি দিলেই কি ভারত অমনি বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে?

আপনারা যে বলেছেন বাংলাদেশে হিন্দুদের কচুকাটা করা হচ্ছে, কিন্তু আপনারা কি "মুসলিম মৌলবাদী" দের হাতে নিহত ১০ জন হিন্দুর একটা তালিকাও কখনো প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন? অবশ্য পরবর্তীকালে নিজেরাই কিছু হিন্দুকে কেটে "মৌলবাদীদের কান্ড" বলে তালিকা প্রকাশ করলে সেটা ভিন্ন কথা। আপনারাতো ক্ষমতায় থাকতেও বলেছিলেন, ইসলামী মৌলবাদীরা দেশজুড়ে বোমা হামলার তাবৎ ঘটনা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন? বরং বিচার বিভাগীয় তদন্তে কি এটাই বেরিয়ে আসেনি যে, বোমা বিস্ফোরণ ও শেখ হাসিনার জীবনের ওপর হামলার সমস্ত ঘটনাই

www.icsbook.info

আপনারা নিজেরাই ঘটিয়ে ইসলামী মৌলবাদী ও বিএনপির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেয়েছিলেন? (বিচারপতি আবদুল বারী কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

বিদেশে বাংলাদেশকে মৌলবাদী প্রমাণের চেষ্টার মাধ্যমে আপনারা কি আসলে দেশের ভাবমূর্তিই নষ্ট করে দেননি? বিদেশী ঋণ সাহায্য ও বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে আপনারা কি সত্যিই জাতির কল্যাণ সাধণ করছেন? বাংলাদেশে মৌলবাদী তান্ডব চলছে? এই অপ-প্রচারের মাধ্যমে আপনারা বাংলাদেশীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক খানিই বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের যেসব মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনে চাকরী ব্যবসাদি করে, তাদেরকে ঘোরতর সন্দেহের পাত্রে পরিণত করেছেন এবং তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছেন, এমনকি অনেককে বেকারেও পরিণত করেছেন। একই অবস্থা হয়েছে বিদেশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদেরও। বাংলাদেশীদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কড়াকড়ি। দেশ, জাতি ও মানুষকে জাহান্নামে পাঠিয়ে হলেও খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের এই উন্মত্ততা কতোটা মানবিক? কতোটা জনদরদী? কতোটা দেশপ্রেমমূলক? কতোটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্মত?

৫৯. আপনারাতো দাবী করেন যে, আপনারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একমাত্র ধারক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে আপনারা কি বুঝাতে চান? ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে আপনারা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন সংজ্ঞা বা বর্ণনা দিয়েছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা এখন দাবী করতে পারেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আপনাদেরই অবদান? দেননি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংজ্ঞা দেওয়াতো দূরের কথা মুক্তিযুদ্ধের চিন্তাই ১৯৭১-এ আপনাদের মাথায় ছিলোনা। আপনারা ব্যস্ত ছিলেন ইসলামাবাদের মসনদে বসার জন্য ইয়াহিয়া-ভূট্টোর সঙ্গে প্রাণান্ত সমঝোতার চেষ্টায় ও আলোচনায়। ৭০-এর নির্বাচনের পরপর যদি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ডেকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলতেন এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতেন, তাহলে আওয়ামী লীগাররা বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধতো করতেনইনা, বরং কেউ করতে চাইলে তাদেরকে নির্মূল করার জন্য তাদের ওপর ইয়াহিয়া টিক্কার চেয়েও নৃশংসভাবে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বা বালুচ রেজিমেন্টকে লেলিয়ে দিতেন, বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বস্তুতঃ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণ ছিলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর ওপর পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠির নির্মম উপনিবেশিক শাসন শোষণ বৈষম্য ও বঞ্চনা, যা এদেশের মানুষকে, বিশেষতঃ এলিট শ্রেণীকে বিরূপ করে তুলেছিলো। আর মুক্তিযুদ্ধের আশু কারণ ছিলো বিজয়ী দল আওয়ামীলীগকে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সরকার গঠন করতে দেওয়ার বদলে বাংলাদেশের জনগণের ওপর

www.icsbook.info

পাকিস্তানী হানাদারদের আকস্মিক একতরফা নৃশংস হামলা, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাঁচার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা ব্যতীত বাংলাদেশের আপামর জনগণ, বিশেষতঃ তরুণ ও জওয়ানদের অপর কোন গত্যন্তরই ছিলোনা।

সেদিন আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, তারা তা করেছিলাম বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারদের উচ্ছেদ করে স্বাধীন-সার্বভৌম-শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করারই জন্য।
আমাদের আশা ও বিশ্বাস ছিলো বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, এদেশে আর শোষণ-বৈষম্য থাকবেনা, উপনিবেশিক উপাদান সমূহের অবসান ঘটবে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে আসবে বিপুল সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি। আমরা তখন এরকম ব্রিফিংই পেতাম এবং অন্যদেরকেও এরকম ব্রিফিংই দিতাম।

অতএব, যে চেতনা থেকে আমরা, লক্ষ লক্ষ তরুণরা অস্ত্র হাতে মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানী হাদানারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তাদের একমাত্র এবং একমাত্র চেতনা ছিলোঃ তদানীন্তন আট কোটি মানুষের সুখ-শান্তি ও সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হানাদারদের উচ্ছেদ করে শোষণ-বৈষম্য মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম করা। প্রতিটি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এটাই এবং একমাত্র এটাই ছিলো ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জোর জিগির তুললেও, আপনাদের সেই চেতনাটার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এযাবৎ দেননি। তবে, ১৯৯১-এর ২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত আপনাদের কার্যক্রম দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, আপনাদের বিচারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিলোঃ রিলিফ, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও দেশের সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা দলীয় নেতাকর্মীগণ কর্তৃক বেপরোয়াভাবে লুটে পুটে নেওয়া (এই সময়কার বিভিন্ন দেশীবিদেশী, বিশেষতঃ বিদেশী পত্র পত্রিকার রিপোর্ট দ্রষ্টব্য এবং দুর্নীতি আত্মসাতের ব্যাপারে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনমূলক উক্তি "এতদিন অন্যরা খাইছে, এইবার আমার লোকেরা খাইব" স্মর্তব্য), সমালোচনাকারীদের ওপর লালঘোড়া দাবড়ে নেওয়া, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী গঠন করা, দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বন্ধ করে দিয়ে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা কায়েম করা, ৪টি সরকারি পত্রিকা ব্যতীত দেশের সমস্ত পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া, নাৎসী আদলে "এক নেতা এক দেশেঃ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ" শ্লোগান তোলা ও তা বাস্তবায়িত করা, বাংলাদেশকে আওয়ামীলীগারদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে গণ্য করা এবং এদেশের রাষ্টক্ষমতায় থাকার এক্তিয়ার ও অধিকার শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের বলে মনে করা ইত্যাদি। এগুলোই যদি আপনাদের "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" না হবে তাহলে এসব কাজ আপনারা করলেন বা করেন কেন? যেহেতু এই সব কাজগুলোর সঙ্গে হিটলার মুসলিনীর ফ্যাসিবাদের হুবহু মিল রয়েছে সেহেতু একথা বলাও কি খুব

www.icsbook.info

অন্যায় হবে যে, আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিলো একদলীয় ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার?

দেখা যাচ্ছে, যারাই আওয়ামীলীগ করেনা এবং আওয়ামী বক্তব্য বলেনা তাদের সবাইকেই আপনারা অভিহিত করেছেন স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী হিসাবে। এমনকি, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, বীরোত্তম, বীরবিক্রম খেতাবধারীদেরও আপনারা ঢালাও ভাবে স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী বলে অভিহিত করে দিতে এতোটুকুও কুণ্ঠিত হচ্ছেননা। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলেই আপনারা বলেছেন স্বাধীনতার চেতনা কায়েম হয়ে গেছে, আর অন্য কেউ ক্ষমতায় গেলেই স্বাধীনতার চেতনা ধ্বংস হয়ে গেলো বলে মাতম তুলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনাদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের অনন্তকাল রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা, দেশের সব মানুষের বাধ্যতামূলকভাবে আওয়ামীলীগ করা এবং বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে যথাক্রমে জাতির পিতা ও সর্বগুণান্বিতা একমাত্র নেত্রী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়াই আপনাদের মতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

আচ্ছা, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে দৃশ্যতঃ বাংলাদেশের একজন মানুষও এই প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনি। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ঘটলে লক্ষ লক্ষ জনতা রাস্তায় নেমে অভ্যুত্থানকারী সিপাহীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলো। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের জানাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম স্বতস্ফুর্ত জনসমাবেশ। ১৯৯১ সালে জনগণ সেই বিএনপিকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছিলো, যেই বিএনপি আপনাদের মতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী।' ২০০১ সালেও বাংলাদেশের জনগণ বিএনপি জামায়াত জাপা (মঞ্জুর) ইসলামী ঐক্য জোট এর চারদলীয় জোটকেই ক্ষমতায় পাঠায় দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে। এমতাবস্থায়, আপনাদের সংজ্ঞানুযায়ী ব্যাপারটা কি এইই দাঁড়ায় না যে বাংলাদেশের জনগণের অন্ততঃ ৬০%-ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" বিরোধী? নইলে তারা আপনাদের ভোট না দিয়ে বিএনপি বা বিএনপি জোটকে ভোট দেয় কেন, যারা আপনাদের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী?

আসলে কারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী? যারা ফ্যাসীবাদী একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তারা? নাকি যারা বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করে তারা? যারা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রক্ষমতায় মৌরসী পাট্টা দাবী করে তারা? নাকি যারা জনতার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তারা?

৬০. আপনারাতো দাবী করেন যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সর্বময় কৃতিত্ব শুধুমাত্র আপনাদেরই। যদি তাইই হয়, তাহলে ১৯৭১-৭৫ এবং ১৯৯৬-২০০১ দু'দুবার

www.icsbook.info

ক্ষমতায় থেকেও আপনারা মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তালিকাই তৈরী করেননি কেন? কেন তালিকা তৈরী করেননি মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের? কেনইবা তালিকা করেননি মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মহিলা বা বীরাঙ্গনাদের? থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়বে এই ভয়ে? "মুক্তিযুদ্ধ" "স্বাধীনতা" ইত্যাদি শব্দকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করলেও, এগুলোর প্রতি আপনাদের আসলে কোনই শ্রদ্ধা নাই বলে? ৩০ লক্ষ শহীদের 'মীথ' মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে এই আশংকায়? যেসব মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগ করেন, তাদেরকেও মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এই ভয়ে?

৬১. ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩ বিজেপি সমর্থিত ছাত্রসংগঠন কোলকাতাস্থ বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশন ঘেরাও করে, বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়ে দেয় এবং ডেপুটি হাই কমিশনার তৌহিদ হোসেনকে এই বলে হুমকি দেয়, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমরা (ভারত) এনে দিয়েছি; প্রয়োজন হলে সেই স্বাধীনতা আমরা আবার ছিনিয়ে নেব।" আপনারাও কি তাইই বিশ্বাস করেন বলেই আপনাদের অন্ধ ভারত অনুরক্তি?

৬২. আপনারাতো এক পর্যায়ে "বঙ্গবন্ধুর চাইতেও হৃদয়গ্রাহী "বঙ্গজননী" খেতাব দিয়ে জাহানরা ইমামকে সামনে খাড়া করে মাঠে নেমেছিলেন। জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধে স্বামী-সন্তান হারিয়েছেন, এজন্য তাঁর প্রতি যে কোন মানুষের সহানুভূতি থাকবে-সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একাজ কি আপনারা একাত্তুরে নির্যাতিত মহিলাদের প্রতি সত্যিকার দরদ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে করেছেন? আপনাদের কি মনে আছে যে, ১৯৭১ সালে যে লক্ষ লক্ষ মহিলা হানাদারদের হাতে নারীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'ইজ্জত' হারিয়েছিলেন, আপনারা তাদেরকে "বীরঙ্গনা" আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কপালে সংশপ্তকের দুরমতির কলংকের মতোই কলংকের অক্ষয়টীকা এঁকে দিয়ে সমাজ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? ভালকথা, যেসব হতভাগিনী সীমান্তের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও তো বিশাল-বিপুল। হানাদারদের দ্বারা নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের পাশাপাশি এসব বীরাঙ্গনাদের কথাও আপনাদের মনে পড়ে কি? আপনারাতো দাবী করেন? আপনাদের আমলে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়ে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কায়েম ছিল। এই সাড়ে ৮ বছর "বীরাঙ্গনাদের" পূনর্বাসনের জন্য আপনারা কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন? এই "বীরাঙ্গনারা" কোথায় আছে, কেমন আছে–তার কোন খবরই আপনারা রেখেছিলেন কি? আপনারা কি জানেন "বীরাঙ্গনার" কলংকের বোঝা বইতে না পেরে আপনাদের রাজত্বকালেই প্রায় ৫০ হাজার হতভাগিনী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল? জাহানারা ইমামদের জন্য আপনাদের এতো দরদ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি নির্যাতিতা লক্ষ লক্ষ ভাগ্যবিড়ম্বিতার বেলায় আপনাদের দরদ ও বিবেক কোথায় থাকে? সবকিছুর সীমা আছে, শুধু সীমা নাই বুঝি আকাশচুম্বি শঠতা, ধৃষ্ঠতা আর পরিহাসের?

www.icsbook.info

৬৩. আপনারা দাবী করেন, আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কিন্তু ধর্মহীনতা, যেমন দলনিরপেক্ষতা মানে কোন দলের আওতায় না থাকা। ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ও অসাম্প্রদায়িকতা (Non-communalism) সম্পূর্ণ ও ভিন্ন বিষয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী Secularism-এর অর্থ হচ্ছেঃ Sceptical of religious truth or opposed to religious education etc. আর Secular মানে হচ্ছে not sacred, no monastic, not ecclesiastical ইত্যাদি। Random House Dictionary of English Language অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে Not belonging tox religious order। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হচ্ছে তারা যারা rejects all forms of religious faith. এক কথায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিকতা সমার্থক। ১৯৪৬ সালে ইংল্যান্ডের G.L Holyoake সর্বপ্রথম এই মতবাদ চালু করেন এবং এর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন Charles Bradlaugh. প্রকৃত অর্থে নাস্তিক আহমদ শরীফই ছিলেন যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ। আপনারাতো নিজেদের বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ততম সৈনিক বলেই দাবী করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কি আদৌ আপনাদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন ছিলেন? তিনি তো পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেই তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন যে, বাংলাদেশই হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তিনিতো ইন্দিরাজী ও ভারতের দুর্বাশা রাগ-বিরাগের তোয়াক্কা মাত্র না করে যোগ দিয়েছিলেন ইসলামী সম্মেলনে, তাও পাকিস্তানে। তিনিতো কথিত রাজাকার আলবদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন; তিনিতো ভূট্টোকে দাওয়াত করে এনেছিলেন বাংলাদেশে। আপনারা কি সত্যি সত্যিই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী?

৬৪. আপনারাতো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম একটি মৌলবাদী' 'সাম্প্রদায়িক' 'প্রতিক্রিয়াশীল, 'ভিত্তিহীন' বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, মহাজঘন্য রাজাকারী-আলবদরী ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক বাকুনিন এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার নিহিলিষ্টরা এবং বিশ্বব্যাপী তাদের উত্তরসূরী সন্ত্রাসবাদীরা যেমন বলতো, "শত্রুর রক্তে হাত রাঙাতে পেরেছি বলে আমরা বিপ্লবী," তেমনি আপনাদেরও প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "আল্লাহ-রাসূল (দঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছি বলেই আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বা প্রগতিশীল"। কিন্তু আপনাদের পিতৃপ্রদত্ত নামসমূহ তো আরবী ও ইসলামী, যা আপনাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঘোরতর "মৌলবাদ ও 'সাম্প্রদায়িক'। সুতরাং , এসমস্ত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক নাম ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করে আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'প্রগতিশীল' নাম গ্রহণ করছেননা কেন? অশালীন ও বেয়াড়া কথা হলেও বলতে হয়, আপনাদের পিতামাতা নিশ্চয়ই আপনাদের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক 'খৎনা'ও করিয়ে দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারেইবা 'আকদ' 'কাবিন' 'দেনমোহর' ইত্যাদি হয়নি তো? হয়ে থাকলে এ

www.icsbook.info

ব্যাপারেইবা এমন কি সিদ্ধান্ত নেবেন? এখন কি ওই বিয়েকে নাকচ করে দিয়ে আপনারা ও আপনাদের কোন মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক কাফন, জানাজা, দাফন, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি হবেনাতো? আপনারা তো জানেন, আপনাদের আদর্শ রাষ্ট্র ভারতের সাবেক উপরাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিদায়েত উল্যাহ মারা গেলে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে তাঁর মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম করীম চাগলা এবং বিশিষ্ট নেতা হামিদ দেলওয়াইকে একইভাবে পোড়ানো হয়। কমরেড মুজাফফর আহমদকে লালকাপড় জড়িয়ে জানাযা ছাড়াই পুঁতে দেওয়া হয়। ভারতের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক আবদুল্লাহ রসুল ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরেরও জানাযা হয়নি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে এই ন্যাক্কারজনক স্ববিরোধিতা কেন? কেন আপনারা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষনা করতে পারছেন না, "আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী নামসমূহ ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলাম, প্রত্যাখ্যান করলাম মৌলবাদী আব্দ, দেনমোহর, কাবিননামা ইত্যাদি, আমরা ও আমাদের বংশধররা এখন থেকে শুধু "লিভ টুগেদার" করবো, আমাদের সন্তানসন্ততিদের কখনো মৌলবাদী খাৎনা হবে না, আমরা ভবলীলা সাঙ্গ করলে আমাদের কোন কাফন-জানাজা দাফন হবে না, আমাদের মৃতদেহকেও ধর্মনিরপেক্ষভাবে পুড়িয়ে ফেলা হবে?" মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু করেছেন, তার সঙ্গে সংগতি রেখে এরকম বলিষ্ঠ ঘোষণা আপনারা দিতে পারছেন না কেন? মেরুদন্ডহীনতার জন্য? ভন্ডামীর জন্য। নাকি কাপুরুষতার জন্য।

৬৫. এটাতো আপনাদের গভীরতম বিশ্বাস যে, ভারতে যা কিছুই ঘটে, তাইই ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল এবং সংস্কৃতির সুষমামন্ডিত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ভারতে মোট ৭৯৪৬টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগটিত হয় এবং ভারতীয়দের হিসাব মতোই এতে নিহত হয় ৭৯৬৫ জন এবং আহত হয় ৪৩,৩১১ জন মুসলমান (ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা "ফ্রন্ট লাইন" ১৫ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যা)। এই হিসাবেও ভারতে প্রতিবছর গড়ে ২৬৫টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা সংগটিত হয়েছে এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯০৫ টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের ২৭ মার্চ তারিখে খোদ পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় বিস্তারি তালিকা প্রদান করে দেখান যে, ওই সময় পর্যন্ত শুধু কোলকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার-গোরস্থান উগ্র হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ২০/১ বেলগাছিয়া রোডস্থ দোতলা মসজিদ থেকে শুরু করে ১৯৭ বৌবাজার স্ট্রীটস্থ মাযার পর্যন্ত ৫৩টি মসজিদ/মাযারের নাম। এ অনুপাতে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী কি বিশাল পরিমাণ মসজিদ/মাযার উগ্র হিন্দুরা দখল

www.icsbook.info

করেছে তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায় অমান্য করে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার বুকের ওপর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় এবং ভারতের নরসিমা রাও সরকার সুপ্রীম কোর্টের রায় ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননা। ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে এযাবৎ কাশ্মীরের মুক্তিকামী মুসলমানদের ওপর লাগাতার নির্যাতন চালিয়ে আসছে, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে, ভারতীয় সৈন্যেরা অসংখ্য কাশ্মিরী মুসলমান রমনীর শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে এবং এই নির্যাতনের প্রক্রিয়াকে দিনে দিনে ভয়াবহতর করে তোলা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা "টাইম" এর ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৩ সংখ্যায় "ওদের জ্বালিয়েদাও" শিরোনামে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "মুসলমান নয়, ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি, মুসলমানেরা যদি (ভারত থেকে) চলে যেতে না চায়, ওদেরকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত"। উপরোক্ত বক্তব্য ও তথ্যাদি সম্পর্কে, আপনাদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদারদের বক্তব্য কি? আপনারাও কি মনে করেন, হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ দখল, মুসলমান হত্যা ও মুসলিম নারী ধর্ষণ খুবই ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল কাজ? আপনারাও কি বাল থ্যাকারের সঙ্গে একমত যে, ভারতের প্রায় ১৬ কোটি মুসলমানের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত, নতুবা ভারতের সব মুসলমানকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা করাই বিদেয়? করুন না একটু আত্মবিশ্লেষণ। দেখুননা, আপনারা যেসব তথাকথিত ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রগতিবাদীদের অনুসরণ করেছেন, তাঁরা হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কি ভূমিকা পালন করেছেন। আর আপনারা কি করছেন? ১৯৯৩-২০০২ সময়ে ভারতে আরো অন্তত: ১০০০ মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ২০০২ সাল এক গুজরাটেই মূখ্য মন্ত্রি নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে হিন্দুত্ববাদীরা পুলিশের সহায়তায় প্রায় ১০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে এবং ধর্ষণ করে প্রায় ৪ হাজার মুসলিম নারীকে। কাশ্মীরেও ঘটানো হয় বর্বরতার চূড়ান্তরূপ। কিন্তু আপনারা কখনোই ভারতের মুসলিম নিধন বা জায়োনিষ্টদের দ্বারা মধ্য প্রাচ্যে মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি; বরং সম্ভবত: মুসলিম হত্যা ও মুসলিম নারী ধর্ষণে পরম উল্লাসিতই বোধ করেছেন। তাহলে আপনারা কি মনে করেন শুধু ইসলামই মৌলবাদী? হিন্দু ধর্ম ইহুদী ধর্ম ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ? এজন্যই কি আপনারা মুসলমান নামধারী হয়েও এসব ধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল? মুসলমান হত্যা ও মুসলিম নারী ধর্ষণওকি আপনাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের শ্রেষ্ঠ পন্থা? নইলে কখনোই আপনারা এর প্রতিবাদ করেন না কেন?

৬৬. প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক নীরদ সি. চৌধুরী শারদীয় সংখ্যা (১৩৯৯) 'দেশ' এ বাংলাদেশকে "তথাকথিত বাংলাদেশ" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন. "একজন মুলমান পাঠান হতে পারে, তুর্কী হতে পারে, মুঘল হতে পারে

www.icsbook.info

কিন্তু কখনোই ভদ্রলোক হতে পারে না" (উপ সম্পাদকীয়, দৈনিক বাংলার বাণী, জানুয়ারী ৩১, ১৯৯৩)। এবার একটু অতীতের দিকে ফিরে চলুন। 'আনন্দমঠ' 'রাজসিংহ' ও দুর্গেশ নন্দিনী' ইত্যাদি উপন্যাসে তীব্রতম মুসলিম বিদ্বেষের বিষ যিনি ছড়িয়েছেন, উগ্রতম ব্রাহ্মণ্যবাদী সেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গও না হয় বাদ দিলাম। উদার বলে কথিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। ১৯৩৩ সালে লিখিত "হিন্দু মুসলিম মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দু মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ। এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মপ্রবঞ্চনা করি কিসের জন্য। এ মোহ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ। সুতরাং এদেশের অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার দায়িত্ব একা হিন্দুদের'। বিমলানন্দ শাসমল তাঁর 'স্বাধীনতার ফাঁকি' গ্রন্থে লিখেছেন, "একথা অস্বীকার করে লাভ নাই যে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা, তা সে বাঙ্গালী হোন বা মারাঠি হোন, সাধারণভাবে মুসলিম বিরোধী ছিলেন"। বিমলানন্দ শাসমল "ভারত কি করে ভাগ হলো" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, হিন্দুরাই মুসলিম বিদ্বেষের দরুন "ভারতকে বিভক্ত করেছে। বিভিন্ন ভারতীয় জেনারেল, বুদ্ধিজীবী ও পত্রপত্রিকার মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতীয়দেরই অবদান। বিএলএল বা মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা জেনারেল সুজন সিং উবান (বর্তমানে একটি আশ্রমে বসবাসরত) তাঁর "Phantoms at Chittagong: Fifth Aramy in Bangladesh" শীর্ষক গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তৎকালীন রেসকোর্সে যখন জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করছিলেন, ঠিক তখনই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় লোকসভার প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা যখন এখানে কথা বলছি, তখন এই উপমহাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছে। ভারত দ্বিতীয়বার মুক্ত হচ্ছে"। আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতির একচ্ছত্র দাবীদার, উপরোক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে তাঁদের মতামত কি?

৬৭. বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নামে একটি সংগঠন আছে। নাম থেকেই সুস্পষ্ট যে এই সংগঠনটির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টানদের ঐক্যবদ্ধ করা। ওরা যদি মুসলমানদের সঙ্গেও ঐক্য চাইতো, তাহলেতো এই সংগঠনের নাম হতো মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। যাইই হোক, মূলতঃ হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনটির বক্তব্য এবং আওয়ামী নেতাবুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য হুবহু একইরূপ। এই সংগঠনটি এখন এতোই দু:সাহসী যে, তারা দাবী করেছে বাংলাদেশে মুসলমানরা তাদের নামের সঙ্গে আলহাজ্ব, মুহাম্মদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবেনা। ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে অবস্থিত সত্যনায়ক মন্দিরে আয়োজিত এক সেমিনারে এই পরিষদের নেতারা ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দু থেকে মুসলমান

www.icsbook.info

হয়েছে। এখন সময় এসেছে এদেরকে আবার হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনার।" ২০০২-এর শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তারা হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশে আলাদা রাষ্ট্র গঠনেরও, যা ভারতভিত্তিক বঙ্গভূমিওয়ালাদের লক্ষ্যেরই অনুরূপ। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও তাদের বক্তব্য ও কর্মকান্ডের সঙ্গে আপনাদের নিবিড় একাত্মতা কি প্রমাণ করে? ১৯৯৩ সালে এবং পরবর্তীতেও এই পরিষদের প্রধান ব্যক্তিত্ব মেজর জেনারেল সি আর দত্ত (অবঃ) ভারতের প্রতি প্রকাশ্য আহবান জানান বাংলাদেশের ওপর হামলা চালানোর জন্য। এটা কি চূড়ান্ত দেশদ্রোহিতা বা হাই ট্রিজন নয়? একবার ভাবুনতো, তাহলে ভারতের কোন মুসলমান যদি পাকিস্তান বা ইরানের প্রতি এরকম আহবান জানাতো, তাহলে তার পরিণতি কি হতো? ভারতীয়রা এই মুসলমানটির হাড্ডি মাংসই কি এক করে দিতোনা? এই ইস্যুতে রায়ট বাধিয়ে হত্যা করতো হাজার হাজার মুসলমানকে? অথচ, আপনারা এই ইস্যুতেও সি আর দত্তদের পক্ষেই রইলেন। এই কি আপনাদের দেশপ্রেম ও ধর্মনিরপেক্ষতা?

৬৮. আপনারা তো বিশ্বাস করেন যে, ভারত ও উগ্র হিন্দুরা যাই করে তাইই সঠিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। এবার দেখুন, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মানবেন্দ্র নাথ রায় এ ব্যাপারে কি বলেছেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত Historical Role of Islam" গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "ভারতের বেশির ভাগ মানুষই গোঁড়া হিন্দু। মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে "ম্লেচ্ছ" "অশুচি" "বর্বর"। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্থ, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার এদের বিচারে কোন মুসলমানেরই প্রাপ্য নয়। মুসলমান যতোই সদ্বংশজাত হোক, সংস্কৃতিবান হোক, গোঁড়া হিন্দুর বিচারে এর কোন ব্যতিক্রম নেই।" এবার আসুন সাম্প্রতিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ভবানী সেনগুপ্তের ভাষ্যে। Hindu Nationalism Closing Indian Mind শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "The barbaric ommunal killings in Bombay in the wake of the Ayodhya incident, the bragging of men like the shiv Sena supremo that incident, the bragging of men like the Shiv Sena supermo that his men are were responsible for the domolition of the Babri Masjid and "I am proud of it, " the large-scale penetration of the minds of millions upon milions of Indians by the RSS. BJP and their allied "Hindutva' bodies, are the cleares and most fearsome evidence of how many human minds in the world's largest democracy have closed down for a mass return to an atavistic past, falsely glorified by the engineers of hatred, fanaticism, beastliness and worse. At the same time pervasive corruption has overtaken our political and social life. human

www.icsbook.info

sensiblities have disppeared behind meaningless slogans ofsocialism and equity, the bureaucracy is emerging as the real governing power, the law and order forces have fallen victiom to partnership and corruption.....The RSS-BSP-VHP combine has taken full advantage of this aggressive confusion prevailing in the power structure and is determined to fundamentally change the charcter of hndian polity by transfromning secular democracy into a Hindu rashtra (state). .....The Hindu forces have now projected a doctrine of HIndu nationalism as the only force that can keep India untied and strong, maintain upper cast and upper class rule, divert people's minds from the pressure of radical political and social change. Hindu nationalismis being projected by different top-ranking leaders of the Sangha parvar (RSS family) with different overtones and uncertones" (পুনঃ মুদ্রিতঃ Dhaka Courier, 12 March 1993) এর আগে ভারতীয় সাংবাদিক আশীষ নন্দী লিখেছিলেন, "As India getting modernized, communal violence is increasing. In the earlier centuries riots were rare. Now we have more than one riot a day" llustrated Weekly of India, July 20-26, 1986).

এরপরও কি আপনারা ধারণা পাল্টাবেন না? এরপরও কি আপনারা উদ্বাহু হয়ে বলতেই থাকবেন যে, বাস্তবে যাইই ঘটুকনা কেন, ভারত সরকার, ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ এবং হিন্দুত্ববাদীরাও হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিমূর্তি?

৬৯. ভারতের আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ) ভারতব্যাপী হাজার স্কুলের এক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। 'বিদ্যাভারতী' নামক এসব স্কুলের কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়ঃ ১. চীনে যারা সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে তারা ছিলো ভারতীয়। ২. ইরানে প্রথম বসতি স্থাপনকারীরাও ছিলো ভারতীয় ৩. মুসলমানরা কাবায় যায় শিবলিঙ্গ পুজা করার জন্য ৪. তাজমহলে কোন কবর নেই, এটা আসলে একটা হিন্দু মন্দির ৫. ডেনমার্কের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী ভারত থেকে নেওয়া ৬. গাভী আমাদের মা। গাভীর ভেতর দেবতাগণ অবস্থান করেন। গাভীর মাথা যেদিকে থাকে সেদিক থেকে নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয়, গোমূত্র ব্যতীত ক্যানসারের অপর কোন ঔষধ নেই। ৭. দিল্লীর কুতুব মিনারের আসল নাম ছিল বিষ্ণু স্তম্ভ। এর নির্মাতা ছিলেন সমুদ্র গুপ্ত। কুতুবউদ্দীন আইবেক এটাকে নিজের নামে কুতুব মিনার করেন, ৮. রাজা পুরুর হাতে আলেকজান্ডার দারুণভাবে মার খেয়েছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রোল কলের সময় বন্দে মাতরম বলাও

www.icsbook.info

বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন, হিন্দুত্ববাদীদের এসব বক্তব্যই সত্য এবং এসব কাজই যথার্থ। নয় কি?

৭০. আপনারাতো গদগদ চিত্তে দাবী করে থাকেন যে ভারতই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। ভারতে মুসলমানদের যে সংখ্যা (প্রায় ১৫%) তাতে সরকারি-বেসরকারি কর্মকান্ড ও ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানদের অংশ থাকার কথা শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	মুসলমান সদস্যের সংখ্যা	মুসলমানদের শতকরা হার
কেন্দ্রীয় সচিব (অতিরিক্ত ও যুগ্ম সচিবসহ)	৪১৬	৬	১.৪০
আই.এ.এস. অফিসার	৩৮৮৩	১১৬	৩.০০
ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস ক্যাডার	১৭৫৩	৫০	২.৮৫
ষ্টেট ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ড সদস্য	১৯	-	০.০০
ষ্টেট ব্যাংকের প্রিন্সিপ্যাল অফিসার	২৭	১	৩.৭০
ভারতীয় শিডিউল ব্যাংক সমূহের পরিচালক	৪৭৩	৬	১.২৭
ইনস্যুরেন্স কোম্পানিসমূহের পরিচালক	২২৫	৪	১.৭৮
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের পরিচালক	৬৪৬৫	১১০	১.৭০
৭৩টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক	৪৮৪	৬	১.২৪
পন্ডস, ব্রুকবন্ড, মুকন্দ আয়রণ, ইন্ডিয়ান টোবাকোসহ ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা	৩৪১৩	৫৯	১.৭৩

এটা হলো ১৯৮১ সালের হিসাব। ইতিমধ্যে অবস্থার আরও ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের অবস্থা আরও শোচনীয়। মসুলমানদের হাতে মোট জমির পরিমাণ ভারতের মোট জমির ৫ শতাংশের কম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন, পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় সকল হিন্দুই (রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সরকারি চাকুরে, সাহিত্যিক, শিল্পী নির্বিশেষে) ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ড. জাকির হোসেন. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ফখরুদ্দীন আলী আহমদ, রফি আহমদ কিদওয়াইদের পর্যায়ের একজন হিন্দুও পাকিস্তানে থাকেননি। কারণ, তাঁরা তাঁদের জন্মভূমিকে আপন বলে ভাবতে পারেননি। তাঁদের কাছে আপন ছিল হিন্দু ভারত। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা তা কখনোই করেননি- প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমানকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা সত্ত্বেও শুধু বিহার অঞ্চলের কিছু গরীব ও গরীব মধ্যবিত্ত মুসলমান (সম্পূর্ণ বা অর্ধেক আত্মীয় স্বজনদের সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের খড়্গের নীচে বলি দিয়ে) পাকিস্তানে

www.icsbook.info

আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলমানদের একচেটিয়া ভাবে ভারত ত্যাগ না করার কারণ জন্মভূমির প্রতি মমতা ও আনুগত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের অবজ্ঞা আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো কেন? আপনারা কি বলতে চান, এই অবস্থা আসলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতারই অনাবিল ফলশ্রুতি। ভারতের অসাম্প্রদায়িকতারই অব্যর্থ লক্ষণ? এই অবস্থার সঙ্গে আরএসএস-বিজেপি-বাল থ্যাকারেদের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য যোগ করলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়?

৭১. আপনাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে আহমদ শরীফ-তসলিমা নাসরীন প্রমূখতো প্রকাশ্যেই দাবী করতেন এবং করেছেন যে, আস্তিকতা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান স্রষ্টার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এখন দেখা যাক, এ ব্যাপারে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা কি বলেন। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব-তথা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এর (সৃষ্টির) পেছনে রয়েছে এক অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্ত্বার এক রহস্যময় অভিপ্রায়। বিজ্ঞানীদের সুদূর প্রসারী জিজ্ঞাসা এখানে বিমূঢ় হয়ে যায়, বিজ্ঞানের চূড়ান্ততম অগ্রগতিও সেখান থেকে তুচ্ছ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সেই অন্তহীন মহাজাগতিক রহস্যের উদ্ভাস বিজ্ঞানীদের এই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের দিকেই পরিচালিত করে যে; এই মহাবিস্ময়কর সৃষ্টির একজন নিয়ন্তা আছেন, যিনি অলৌকিক জ্ঞানময়। তাঁর সৃষ্টিকেই শুধু অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁকে মানবকল্পনায় বিধৃত করা যায় না।" স্যার জেমস জীনস এই প্রসঙ্গে বলেছেন "মহাবিশ্ব আমাদের সকলের মনের অতলে অবস্থিত এবং সকল মানের সমন্বয় সাধনকারী কোন এক মহান মহাবিশ্বজনীন মনের সৃষ্টি, মনে হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন সেদিকেই প্রধাবিত হচ্ছে"। পদার্থবিদ ক্লারেন্স এবারসোল্ড এর মতে, "বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কে একটি মহাপ্লাবনিক তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারে, যা আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত। বিজ্ঞান এই ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, গ্রহ-উপগ্রহসমূহ এবং অণুপরমাণুর সৃষ্টি রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে। কিন্তু এই সৃষ্টির উপাদান জড়পদার্থ ও শক্তি কোত্থেকে এসেছে এবং কেন এই মহাবিশ্ব এমন সুশৃংখল নিয়মের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে (ধরাছোঁয়ার আওতায় প্রমাণযোগ্য) কোন ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান আয়ত্ব করতে পারবে না। অবিমুক্ত চিন্তা ও বিচার শক্তি এই "কেন"-এর জবাবে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত ধারণাকেই শুধু দ্বিধাহীন করে তুলবে"। লর্ড কেলভীনতো আরো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।" বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "বিশ্বে পূণর্বার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুহাম্মদ (দঃ)-এর মতো নেতৃত্ব আবার প্রয়োজন।" এরকম উহাদরণের অন্ত নেই। বৈজ্ঞানিককূলের বিস্ময় ষ্টিফেন হকিং পর্যন্ত পরম স্রষ্টায় বিশ্বাসী এবং তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, একদিন না একদিন মানুষ পারবে স্রষ্টার মন বুঝতে

www.icsbook.info

অর্থাৎ সৃষ্টির পেছনে তাঁর চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে। এসব বিজ্ঞানীদের কথাই যদি মানতে হয়, তাহলে তো পরম সচেতন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অবিশ্বাস করার কোন উপায়ই থাকে না।। সেক্ষেত্রে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাহর অবিশ্বাসেরইবা যুক্তি থাকে কোথায়? নাকি আপনারা বলতে চান যে, আইনষ্টাইন, কেলভিন, ষ্টিফেন হকিং প্রমূখ বিশ্ব বরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের ধারণাই অবৈজ্ঞানিক? আর আপনারা, যাঁরা বিজ্ঞান ও ধর্মের কোনোটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না, তাঁদের ধারণাটাই বৈজ্ঞানিক?

প্রসংগতঃ আরও উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক খ্রিষ্টান প্রধান দেশেই সরকার প্রধানকে বাইবেলের ওপর হাত রেখেই শপথ গ্রহণ করতে হয়। মার্কিন ডলারের ওপরও লেখা আছে In Good We Trust. বৃটেনে আইন আছে প্রোট্যাষ্ট ছাড়া কেউ বৃটেনের রাজা বা রানী হতে পারবেননা। অনেক খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশে Heresy যা খ্রিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, উপ-প্রধান মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী প্রমূখও ঘোষিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী। এদের ব্যাপারেইবা আপনাদের রায় কি?

৭২. আপনাদের চিন্তায় বিচারে তো ভারতই আদর্শ নমস্য রাষ্ট্র। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা ওং কার ভাবের মতে "হিন্দুত্ব ও ভারত অবিচ্ছেদ্য।" ভারতে রয়েছে শিবসেনা, বজরং দল, বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দমার্গ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, সন্তান দল ইত্যাদি বিভিন্ন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "আমি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলে ঘোষণা করছি। কারণ- (১) বেদ, উপনিষদ, পূরাণ এবং যা কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত, তার সব কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং অবতার আর পুনর্জন্মেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে। (২) ধর্মের বর্ণাশ্রমেও আমার বিশ্বাস সুদৃঢ়। তা সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক; (৩) সাধারণ মানুষের ধারণার চেয়েও আমার ধারণা অনেক ব্যাপক; (৪) মূর্তি পূজায়ও আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।" (M. K. Gandhi, Young India, 12 October, 1921)। গান্ধীজী আরও বলেন, "আমি সর্বপ্রথম হিন্দু, তারপর দেশপ্রেমিক। .....আমি বর্ণভেদ মানি। .....মনুষ্য যোনিতেই মানুষ জন্মায়। এই জন্যই বর্ণ নির্দেশ করে (Young India, 21 January, 1926)। তাঁর চূড়ান্ত ঘোষণা, আমার কাছে ধর্মশূন্য কোন রাজনীতি নেই। ধর্ম বিরহিত রাজনীতি এক মৃত্যু ফাঁদ। তা আত্মাকে হনন করে। (Young India, 3 April, 1924)। এখন আপনারা, ধর্মনিরপেক্ষতা বাদী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবীদাররা, গান্ধীজী সম্পর্কে কি মূল্যায়ন করবেন? অবশ্য খ্রিষ্ট ধর্ম, জায়ানবাদ ও হিন্দুত্ববাদ যদি আপনাদের বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা গান্ধীজীকেও

www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত আদর্শ বলে অভিহিত করতে পারেন বৈকি। তাইই কি আপনারা করবেন?

৭৩. বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত আদর্শ ছিলো বাকশাল। এই বাকশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নরত অবস্থায়ই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি যদি আপনাদের বাস্তবিকই কোন শ্রদ্ধাবোধ থেকে থাকে, তাহলে আপনারা তাঁর চূড়ান্ত আদর্শ 'বাকশাল' কে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেন? কেন আপনারা বাকশালের কথা আর উচ্চারণ মাত্র করেন না? কেন আপনারা বলেন না যে, আপনারা আবার ক্ষমতায় গেলে বঙ্গবন্ধুর বাকশাল ব্যবস্থাই কায়েম করবেন। বাংলাদেশে একটি মাত্র দল রেখে বাদ বাকী সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন, শুধুমাত্র ৪টি পত্রিকা বাদে দেশের সমস্ত পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন? কেন আপনারা বলেন না যে, আপনারা আবার ক্ষমতায় গেলে "বাকশাল" অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সরাসরি রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে বাধ্য করবেন? কেন আজ আপনারা বাকশাল কনসেপ্টের সম্পূর্ণ বিপরীত "ফ্রি ইকনমি'র কর্মসূচী হাজির করেছেন? ১৯৯৬-২০০১ সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে তাঁরই রেখে যাওয়া দল দাপটের সঙ্গে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কেন কায়েম করা হলো না বাকশাল? আপনারা বঙ্গবন্ধুর এতো স্বপ্নের কথা বলেন। অথচ বাকশালইতো ছিলো বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। আপনারা কি এখন বলতে চান বঙ্গবন্ধু বাকশাল করে ভুল করেছিলেন? তাহলে, সেটাইবা স্পষ্ট করে বলছেন না কেন? আপনারা একদিকে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, অন্যদিকে দাবী করেছেন আপনারাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী। এটা কি অত্যন্ত নীচুস্তরের প্রবঞ্চনা, শঠতা ও মোনাফেকি নয়? আসলে আপনারাই সরলপ্রাণ বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে বাকশাল করিয়েছিলেন, তাঁকে ধিকৃত করার মূল্যে আপনাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এটাই কি সত্যি নয়? বাকশাল কনসেপ্টকে ছুঁড়ে ফেলে যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যায়না আব্রাহম লিঙ্কনের প্রতি, হিন্দুত্ব ও বর্ণাশ্রমকে বর্জন করে যেমন হয় না মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধ প্রদর্শন, ঠিক তেমনি বাকশাল ও মুজিববাদকে বর্জন করেও কিভাবে সম্ভব বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন? এ আপনাদের কি ধরনের বঙ্গবন্ধু ভক্তি?

৭৪. বাংলাদেশের মানুষ ২৮ বছরে দু' দুবার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, যা বিশ্বের ইতিহাসে কোন জাতি কোনদিনই পারেনি। প্রথমবারের স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনও মূলতঃ কোন মৌলবাদী আন্দোলন ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও ছিলেন না এমন কোন গোঁড়া ধর্মপরায়ণ মানুষ। তিনি মদ পান করতেন। পোর্ক খেতেন বলেও শোনা যায়। নামায রোযা হজ্ব জাকাতের কোন ধার তিনি ধারতেন না। বিয়েও করেছিলেন অগ্নিউপাসক স্যার দীনশা পেটিটের মেয়ে রতন

www.icsbook.info

বাঈকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এদেশ হিন্দু মুসলমান সকলেরই। বস্তুত, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিচালিত হিন্দু মুসলিম ঐক্যপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই, কংগ্রেসের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যই মুসলমানেরা ১৯৩৭-৪০ সালে সর্বপ্রথম আলাদা রাষ্ট্রের কথা ভাবতে বাধ্য হয়) যাইই হোক, হুবহু লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তান কায়েম করা না গেলেও, বঙ্গবন্ধুরা ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান কায়েম করেন, তারই ভৌগোলিক কাঠানো থেকেই ১৯৭১ সালে বেরিয়ে আসে বর্তমান বাংলাদেশের কাঠামো। অথচ, আপনারা বলেছেন পাকিস্তানের জন্মটাই ভুল ছিল। তাহলে আপনারা কি বলতে চান পাকিস্তান আন্দোলন করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতা সহযোগীরা ভুল করেছিলেন? আপনারাইতো বলেন, জনগণ কখনোই ভুল করে না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের গণভোটে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে এতো বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়েছিলেন, যা সেকান্দর হায়াত খানের মতো জাঁদরেল নেতার নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাবেও সম্ভবপর হয়নি। আপনারা কি তাহলে বলতে চান, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ তো আজ বঙ্গ প্রদেশের অংশ হিসাবে ভারতেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতো। সেক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করা কি আপনাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হতো? হলে, তা কিভাবে হতো? মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, হরিয়ানা, কেরালার অভিজ্ঞতা আপনাদের কি শিক্ষা দেয়? ১৯৭১-এ বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে যে স্বাধীন হতে পেরেছিলো, তার প্রধান কারণ ছিলো পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু পরস্পর সংলগ্ন ভারতের কোন অংশ কি ৫৭ বছরেও স্বাধীন হতে পেরেছে? সেক্ষেত্রে ভারতভূক্ত হলে আপনারা কিভাবে স্বাধীন বাংলা কায়েম করতেন? বর্তমান যে বাংলাদেশ-এর মানচিত্রটাতো তৈরী হয়েছিলো ৪৭-এর পাকিস্তান সৃষ্টির ফলশ্রুতিতেই। ভারতের সঙ্গে একিভূত থাকলে এই মানচিত্রটি আপনারা কোথায় কিভাবে পেতেন? কিভাবে বর্তমান বাংলাদেশের এলাকা বা সীমানা চিহ্নিত করতেন? নাকি আপনারা বলবেন যে, ভারতভূমির অন্তর্ভূক্ত হলে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন প্রয়োজনই আর হতো না? অবশ্য একথা ঠিক, বাংলাদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলে, নেহেরু-ইন্ডিয়া-মোরারজীদেশাই-নরসিমা-বাজপেয়ীদের রাজত্বে বসে, এবং আদভানী-বাল থ্যাকারেদের সরাসরি পদানত থেকে শিব ও শিবাজীর সেবা-স্তুতি অনায়াসেই করা যেতো। কিন্তু সেই সুযোগ থেকে তো আপনাদের বঞ্চিত করেছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতা-সহযোগিরাই। এই বাস্তবতার আলোকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আপনাদের কি মূল্যায়ন? কি কি সুবিধা হতো আপনাদের ১৯৪৭ সালেই বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলে?

৭৫. ইতিহাসে ধোপে তাইই টেকে, যা বাস্তব সত্য। গায়ের জোরে কোন কিছু ইতিহাস বা জনগণের ওপর চাপাতে চাইলেও তা বিতর্কিত ও শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত

www.icsbook.info

হতে বাধ্য। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমানসহ সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কেউ হাজার চেষ্টা করলেও যেমন বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে পারবেনা, তেমনি কেউ হাজার চেষ্টা করলেও পারবেনা বঙ্গবন্ধু যা ছিলেননা বা যা করেননি তাঁর ওপর তাইই আরোপ করে টিকিয়ে রাখতে। এটাই কি সত্যি নয়?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে এযাবৎ আপনারাতো আপনাদের হাজার মুখে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে, বিশাল প্রোপাগান্ডা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রাণান্ত প্রোপাগান্ডা চালিয়ে, শতশত বই পুস্তক লিখে এবং আপনাদের অতি শক্তিশালী মিডিয়ার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও কি বাংলাদেশের সমস্ততো দূরের কথা, অধিকাংশ জনগণকেও একথা বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে, ১. বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক, ২. বঙ্গবন্ধুই জাতির পিতা ৩. যমুনা সেতুসহ দেশের সকল কর্মকান্ড ও স্থাপনাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ৪. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আওয়ামীলীগেরই একক কৃতিত্ব ৫. আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ সকলেই স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী রাজাকার আলবদর এবং ৬. একদলীয় বাকশাল আমলও গণতান্ত্রিক, তারপরের ২১ বছরই স্বৈরতান্ত্রিক (১৯৯১-এর অবাধ-নির্বাচনে নির্বাচিত বিএনপি সরকার সহ) আবার ১৯৯৬-২০০১ সালে শেখ হাসিনার আমলটাই গণতান্ত্রিকতার মাহাত্ম্যে ভরপুর এবং ২০০১ এর আওয়ামী লীগেরপরাজয়ের মধ্য দিয়ে আবার গণতন্ত্র উধাও, অর্থাৎ শুধু আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাটাই গণতান্ত্রিক এবং আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় না থাকাটাই স্বৈরতান্ত্রিক? বাংলাদেশের সব মানুষ যদি আপনাদের তত্ত্বে ও বক্তব্যে বিশ্বাস করতো, তাহলে তাদের সবাই তো সকল নির্বাচনে আপনাদেরকেই সব ভোট দিয়ে দিতো। কিন্তু জনগণ তা দেয়না কেন? কেন জনগণ ১৯৯১-এ ও ২০০১এ আপনাদের বিরুদ্ধে রায় দিলো? ২০০১-এর নির্বাচনে যে ৬০% ভোটার আপনাদেরকে ভোট দেয়নি, তারাও কি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক ইত্যাদি বলে স্বীকার করে?

বাংলাদেশের সব মানুষতো দূরের কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও যদি বঙ্গবন্ধুর সর্বকৃতিত্ব ও একক অবদানের তত্ত্বে বিশ্বাসী হতো, তাহলে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর জনগণের বৃহদাংশ আনন্দিত এবং বাকি অংশ নির্বিকারচিত্ত হয়ে রইলো কেন?

আপনারাতো আপনাদের গোটা রাষ্ট্রশক্তি, দলীয় শক্তি ও মিডিয়া শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন জিয়াউর রহমানের নাম ও অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু তা কি আপনারা পেরেছেন? জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আপনাদের অর্থাৎ আওয়ামীলীগার বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কথাই যদি জনগণ বিশ্বাস করতো, তাহলে জনগণ বার বার জিয়াউর রহমানের দলকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে দেয় কি কারণে? অবশ্য, আপনারা বলতেই পারেন যে, ভোটারদের ১০০%-ই আসলে আওয়ামীলীগকেই ভোট দিয়ে

www.icsbook.info

দেয়, কিন্তু সাহাবুদ্দিন আহমদ লতিফুর রহমান এবং এমএ সাঈদরা বিএনপির সংগে চক্রান্ত করে কোন ভোট না পাওয়া সত্ত্বেও বিএনপি বা তদীয় জোট প্রার্থীদের বিজয়ী করে দেয়। আচ্ছা বঙ্গবন্ধুর দল কর্তৃক নিয়োজিত সাহাবুদ্দিন আহমদ, লতিফুর রহমান, এমএ সাঈদরাইবা বঙ্গবন্ধুর দলের বিরুদ্ধে এতো 'চক্রান্ত' করে কেন? আপনাদের এহেন বক্তব্যেরইবা যৌক্তিকতা, সত্যতা ও বিশ্বাসযেগ্যতা কতটুকু?

আপনারাতো আপনাদের ফরমায়েশি লেখকদের দিয়ে ফরমায়েশি ইতিহাসে লেখাতেও প্রাণপন প্রয়াস চালিয়েছিলেন। প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন আপনাদের বাংলাপিডিয়া বের করতে। পেরেছেন? অবশ্য, আর একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে আপনারা যে আপনাদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো ইতিহাস ও বাংলাপিডিয়া আবার লেখাবেনই, এটা অনিবার্য। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি বা অন্য কেউ আবার ক্ষমতায় গেলে এগুলোকে যে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে, সেটাও কি একইরূপ অনিবার্য নয়? আপনারা ক্ষমতায় গেলে যে আবার আইন করে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙাতে বাধ্য করবেন, এটা যেমন অবধারিত, তেমনি পরবর্তীতে বিএনপি আবার ক্ষমতায় গেলে ওই আইন যে বাতিল করে দেবে, এটাও কি সমভাবে অবধারিত নয়? বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এহেন খেলায় আপনারা কি সত্যিই খুবই আনন্দিত? পরিতৃপ্ত? এই খেলার মাধ্যমে তো আপনারা এযাবৎ আপনাদের বক্তব্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকেও বিশ্বাস করাতে পারেননি। রোজ কিয়ামত পর্যন্তও বিশ্বাস করাতে পারবেন কি?

সবচেয়ে বড়ো কথা, বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বাধীনতার ঘোষকত্ব, জাতির পিতৃত্ব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নত্ব ইত্যাদি তাবৎ কৃতিত্ব আরোপ করতে গিয়ে আপনারা কি এই মানুষটিকে সর্বজনশ্রদ্ধাভাজন করার বদলে বিতর্কিতই করে ফেলেন নি? ইতিহাসে তাঁর যে গৌরবময় স্থানটি ন্যায়ত; ই প্রাপ্য, তা থেকেও কি তাঁকে বঞ্চিত করেননি? আপনারা কি আপনাদের প্রতিপক্ষ দলের প্রধান পুরুষটির ওপর আঘাতের পর আঘাত হেনে, তাদেরকেও বাধ্য করেন না বঙ্গবন্ধুর ওপরও আঘাত হানতে? ব্যাপারটা কি নিতান্তই পাশবিক নয়?

আপনারাই কি আপনাদের অনুদারতা, একপেশেতা, উগ্রতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার দ্বারা জাতির বঙ্গবন্ধুকে শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের বঙ্গবন্ধুতেই পরিণত করে ফেলেন নি? এখন কি আওয়ামীলীগারদের বাইরে সত্যিই বঙ্গবন্ধুকে একনিষ্ঠ ভক্তের খুব একটা অস্তিত্ব আছে? এই পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী? আপনারাই নন কি?

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শারীরিক ভাবে নিহত হন, কিন্তু অতি বাড়াবাড়ির মাধ্যমে আপনারাই কি বঙ্গবন্ধুর সত্বাকেই হত্যা করেন নি? আপনারাই কি দায়ী নন বঙ্গবন্ধুর এই দ্বিতীয় ও প্রকৃত হত্যাকান্ডের জন্য?

www.icsbook.info

৭৬. বঙ্গবন্ধুকে আপনারা যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার মধ্যে কি আদৌ কোন সত্যতা আছে? অথচ বঙ্গবন্ধুর মধ্যেতো কোনই স্ববিরোধিতা ছিলোনা। তিনি পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য স্বায়ত্বশাসন অর্জন ও বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ৬ দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করেছিলেন, ছাত্রলীগের একাংশ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিলে তিনি দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলেছিলেন "আমাদের ম্যান্ডেট স্বায়ত্বশাসনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য নয়, তাদেরই চাপের মুখে একাত্তরের ৭ মার্চ **"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"** একথাটা বলতে বাধ্য হলেও এর আগে বা পরে আর কখনোই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেননি, তার দল আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়ের কোন কমিটিতে বা ফোরামে কখনোই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মর্মে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত পাস হতে দেয়নি, স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ তিনি কখনোই চাননি বিধায় এর জন্য কোন কমান্ড ষ্ট্রাকচার বা সরকারও গঠন করেননি, হানাদারদের ক্র্যাকডাউনের এক ঘন্টা আগেও তিনি পরদিন ইয়াহিয়া-ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারে ব্যারিষ্টার কামাল হোসেনের নিকট ব্যাগ্রতা প্রকাশ করেছেন, অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হওয়ার পরও ভারতে যাওয়া বা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানের বদলে তাঁদেরই সৃষ্ট পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হানাদারদের পরাজয়ের পরও তিনি ভূট্টোর কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন (যদিও তিনি বাংলাদেশে এসে বাস্তবতা দেখার পর ওই চিন্তা স্বভাবত:ই পরিহার করেন। এ প্রসঙ্গে এন্থনী ম্যাসকারানহাস এর লিগ্যাসী অব ব্লাড গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফেরার সময় ভারতীয় বিমান ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছেন, ১০ জানুয়ারী ১৯৭২, ঢাকা বিমান বন্দরে নেমেই ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তিনি কখনোই বলেননি), প্রথম সুযোগেই ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য করেছেন বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় ফৌজ তুলে নিতে, জীবনে কোনদিনই "মুজিবনগর" দেখতে যেতেও রাজী হননি, মুক্তিযুদ্ধের সময় কে কোথায় কি ভূমিকা পালন করেছিলেন কিংবা কোথায় কি ঘটেছিলো তাও কখনো জানতে চাননি এবং কেউ বলতে চাইলেও তা শুনতে চাননি (এব্যাপারে তদানীন্তন আওয়ামীলীগ দলীয় সংসদ সদস্য এমএ মোহাইমেনের ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ দ্রষ্টব্য), ১৯৭৩ সালে হানাদারদের দোসরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যার ফলে বাংলাদেশ আইনগতভাবেই রাজাকার আলবদর বলে আর কিছুই থাকেনি এবং সাবেক রাজাকার আলবদররাও দেশের তদানীন্তন ও বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের সমকক্ষ নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলো, ভারতের প্রবল অনীহার মুখেও ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেছেন (যার ফলে ক্ষুব্ধ

www.icsbook.info

ভারতীয়রা কোলকাতায় বঙ্গবন্ধুর কুশপুত্তলিকা দাহ করে), যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর গোঁয়ার্তুমি ও চক্রান্তের ফলেই ১৯৭১ সালে পাক হানাদাররা বাংলাদেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো বিশ্ব ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণের তান্ডব, ধ্বংস ও নির্যাতন, ১৯৭৪ সালের ২৭-২৯ জুন সেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকেই তিনি বাংলাদেশে দাওয়াত করে এনে ইন্দিরা গান্ধীর সমকক্ষ রাজকীয় সংর্বধনা প্রদান করেছেন (অথচ তখনো পর্যন্ত পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিই দেয়নি) এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভা থেকে বের করে দিয়েছেন, অথচ পাকিস্তানপন্থী খোন্দকার মোশতাক আহমদকে মন্ত্রীসভায়তো সসম্মানে বহাল রেখেছেনই, উপরন্তু তাঁকে আওয়ামী লীগ ও বাকশালেরও শীর্ষ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। এইই হলো বঙ্গবন্ধুর সত্যিকার ও বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি। একমাত্র প্রতিকৃতিও বটে।

এসব কারণেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডকে ইন্দিরা গান্ধিরা নীরব সমর্থন প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন এই বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ঘটনা। একারণেই তদানীন্তন ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন সহাস্যে খোন্দকার মোশতাককে অভিনন্দিত করেছিলেন। এ কারণেই ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত তাঁর 'লিভারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, শেখ মুজিবের কর্মকান্ড ছিলো মুসলিমলীগেরই আওয়ামী সংস্করণ।

এখন আপনারাই বলুন, যে বঙ্গবন্ধুকে আপনারা জাতি ও ইতিহাসের ঘাড়ে জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে চাইলেন, সেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কি আসল বঙ্গবন্ধুর আদৌ কোন মিল আছে? এভাবে আসল বঙ্গবন্ধুর স্থলে আপনাদের সংকীর্ণ স্বার্থ, ও সাম্রাজ্যবাদী-হিন্দুত্ববাদী আনুগত্যের কারণে অন্য এক বঙ্গবন্ধুকে চাপিয়ে দিতে গিয়েই কি আপনারা তাঁকে বিতর্কিত করে দেননি? খেলো এবং হেয় প্রতিপন্ন করেননি? ইতিহাসে তাঁর সুউচ্চ স্থান থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেননি? করছেন না?

৭৭. ১৯৯৬-২০০১ সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেয়ার বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, টাকার মান, ঋণ খেলাপীর অংক, বিনিয়োগের হার সহ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরম বিপর্যয় দেখা দেয়, পুলিশ প্রশাসন সহ রাষ্ট্রের সকল বিভাগ ও সংস্থাকে শতকরা প্রায় একশত ভাগ দলীয়কৃত করা হয়, দলীয় নরদানবের প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়, আদালতকে হুমকির পর হুমকি দিয়ে চরম ত্রাসের মধ্যে রাখা হয় এবং বাংলাদেশকে পরিণত করা হয় বিশ্বের ১ নং দূর্নীতিবাজ দেশে (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ওই সময়কার রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) অথচ, আপনারা বলতেন এবং বলেন যে, ওই পাঁচ বছরে তার আগের একুশ বছরের মোট

www.icsbook.info

উন্নয়নের ১০ গুণ বেশি উন্নয়ন আপনারা সাধন করেছেন। কিন্তু জনগণ আপনাদের, তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা বুদ্ধিজীবীদের এই কথা আদৌ বিশ্বাস করেনি। বরং জনগণ আপনাদের সীমাহীন অযোগ্যতা, দূর্নীতি, দলবাজী ও হিংস্রতায় ত্যক্তবিরক্তক্ষুব্ধ হয়ে আপনাদের প্রতিপক্ষকেই পার্লামেন্টে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে জিতিয়ে দেয়। এই শোচনীয় পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের উচিত ছিলো আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণে ব্রতী হওয়া; ত্রুটি বা Lapses সমূহ সংশোধন করে মানবিক ও বিনয়ী অ্যাপ্রোচ দিয়ে জনগণকে উইন ওভার করা। কিন্তু আপনারা সে পথেই গেলেন না। তার বদলে আপনারা তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট, কেয়ার টেকার সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ওপর এই বলে হামলে পড়লেন যে, তাঁরা আপনাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে চক্রান্ত করে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও আপনাদেরকে হারিয়ে দিয়েছেন। এই উদ্ভট লাইন নিয়ে শুরু করলেন দেশেবিদেশে হল্লা এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিএনপি জোট সরকারকে কালবিলম্ব না করে উৎখাত করে দিয়ে আপনারা গদীর দখল নিয়ে নেবেন। কিন্তু দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া একটা সরকারকে পত্রপাঠ উৎখাত করে দেওয়াতো আর চাট্টিখানি কথা নয়।

এমতাবস্থায়, আপনারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আপনারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মর্মে জোর প্রচার চালাবেন যে, বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের তান্ডব চলছে, এখানে অমুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছে এবং খালেদা জিয়া সরকারই পরিণত হয়েছে তালেবান সরকারে। আপনারা আশা করেন যে, আপনাদের প্রচারে ক্ষিপ্ত-প্ররোচিত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও তাঁর চক্র বাংলাদেশেও সামরিক হামলা চালিয়ে খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে আপনাদের ক্ষমতার বসিয়ে দেবে, ঠিক যে ভাবে তারা আফগানিস্তানে তালেবানদের উৎখাত করে বসিয়ে দিয়েছিল হামিদ করাজাইকে। বিকল্প হিসাবে আপনারা আপনাদের মূল নির্ভর ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের শরনাপন্ন হন এবং উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী লাল কৃষ্ণআদভানী (ভারতের উপপ্রধান মন্ত্রী) প্রমুখের সঙ্গে আপনাদের পদক্ষেপের (সম্ভবতঃস্বার্থেরও) চমৎকার সম্মিলনও ঘটে। ভাড়াটে লেখক বার্টিল লিন্টনার লিখিত প্রবন্ধ Bangladesh: A Cocoon of Terror (Far Eastern Economic Review, April 04, 2002). অ্যালেক্স পেরী লিখিত Deadly Cargo (the Time October 21, 2002), ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত, ডিসেম্বর, ২০০২ -এর শেষের দিকে দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবে গৌড়া ও আই কে গুজরাল থেকে শুরু করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র প্রমুখের সঙ্গে শেখ হাসিনার গোপন বৈঠক, ভারতীয় পত্রপত্রিকা এবং ভারতের উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী লালকৃষ্ণ আদভানী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণান্ডেজ প্রমুখের বক্তব্যের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও

www.icsbook.info

তাঁর অনুগত নেতাবুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যের অক্ষরে অক্ষরে মিল ইত্যাদি থেকে কি এটাই প্রতিয়মান হয় না যে, এই সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে এবং এর কলকাঠিও নাড়া হচ্ছে হয়তোবা এক জায়গা থেকেই? কিন্তু আপনারা এটা কখনোই বুঝার চেষ্টা করেননি যে, বাংলাদেশ আফগানিস্তানও নয়, ইরাকও নয়, কাশ্মীরও নয়? ফলে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গোলযোগ, পণ্য আগ্রাসন, মিডিয়া আগ্রাসন, তাদের বাংলাদেশী এজেন্টদের তৎপরতা ভয়ংকর রকম বৃদ্ধি, জুম্মল্যান্ড ও বঙ্গভূমিওয়ালাদের লেলিয়ে দেওয়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো ইত্যাদি হয়তো খুবই করতে পারবে, কিন্তু বাংলাদেশ আফগান ষ্টাইলে হামলা চালানো কি ভারতের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হবে? মানুষ অনেক সময় তিলকে তাল করে। কিন্তু বাংলাদেশ যেখানে একটিমাত্র তালেবান বা আল কায়েদাদের ঘাটিও এযাবৎ (২০০২) আবিস্কৃত হয়নি, যেখানে একজন মাত্র হিন্দুও প্রকৃত অর্থে "মৌলবাদী সন্ত্রাস" এর কারণে নিহত হয়নি, সেখানে আপনারা সম্পূর্ণ অসত্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে যে মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণের জন্য আদাজল খেয়ে নামলেন, এটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতারই নামান্তর নয়? এরকম ভাবে বিদেশী শক্তিকে বাংলাদেশে হামলা চালানোর জন্য উস্কানি দেওয়া কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা স্বাধীনতার চেতনার সঙ্গে আদৌ সাযুজ্যপূর্ণ? একটা নির্বাচনের গণরায় না মানা এবং নির্বাচিত সরকারকে বসামাত্রই বিদেশী যোগসাজষে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত কি সত্যিকার কোন গণতন্ত্রীদের কাজ? ২০০৩ সালের শেষের দিকে আপনারা ঘোষণা দেন যে, ২০০৪ সালের মাচ-এপ্রিলের মধ্যেই আপনারা খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে দেবেন? পারবেন? পেরেছেন? না পারলে এরকম মুরোদহীন ঘোষণার স্বার্থকতাটাইবা কি?

৭৮. ১৯৯৬-২০০১ সালে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ফেনী, লক্ষীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা ভয়ংকর সন্ত্রাসী গডফাদারদের প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন প্রদান, মন্ত্রী-চীফ হুইপ-দলীয় নেতা প্রমুখের পুত্রদের বেপরোয়া সন্ত্রাসে পৃষ্ঠপোষকতা, পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় ক্যাডারে পরিণতকরণ, ঘুষ-দূর্নীতির অবাধ বিকাশ, তড়িঘড়ি করে দলীয় নেতা কর্মীদের প্রায় ২০ হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান (যাতে লাইসেন্সের আড়ালে বিপুল অবৈধ অস্ত্র সমূহও যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা যায়?) ইত্যাদির ফলে আইন শৃংখলা সম্পূর্ণ রূপেই ভেঙে পড়ে, ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে বখরার সম্পর্কে লিপ্ত পুলিসরা ক্রিমিন্যালদের ধরার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে এবং অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। এমতাবস্থায় ২০০২ সালের শেষের দিকে বেগম খালেদা জিয়া সরকার সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান "অপারেশন ক্লিন হার্ট" শুরু করতে বাধ্য হন। এতে দৃশ্যতঃই অস্ত্রবাজী, চাঁদাবাজী, দখলবাজী, খুন, হাইজ্যাক ইত্যাদি অন্তত ৭০% হ্রাস পায় (যদিও নিতান্তই

www.icsbook.info

সামরিকভাবে) এবং ১৪ কোটি মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে (এই সময়কার দৈনিক প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট অনলাইন জরীপ সমূহের ফলাফলও প্রসংগতঃ দ্রষ্টব্য)। অথচ, আপনারা জনগণের বাস্তব অনুভূতির সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন যে, এই অভিযানে জনগণ নাকি মহা সন্ত্রস্ত, নির্যাতিত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এরই নাম কি রাজনৈতিক সততা? কিংবা রাজনৈতিক কূটকৌশল? আপনারা যাইই বলেন, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হলেও জনগণ তাইই বিশ্বাস করবে, জনগণকে এমন বোকা ভাবাটা কি সত্যিই আপনাদের অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক?

৭৯. ২০০২ সালের শেষের দিক থেকেই বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী সন্ত্রাসী দেশ এবং বাংলাদেশে তালেবান আল কায়দাদের ভয়ংকর তৎপরতা আছে, এটা প্রমাণ করার জন্য পূনরায় শুরু করা হয় ধ্বংসাত্মক তৎপরতা। ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বরের ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্ততঃ ২০ ব্যক্তিকে হত্য এবং ২০০ ব্যক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। এসব ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো নিম্নরূপঃ

১. ভারতের উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দুত্ববাদী আর এস এস. বজরং, বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং লালকৃষ্ণ আদভানীদের বিজেপি প্রমুখ যে বলে বাংলাদেশে তালেবান আল-কায়দাদের তান্ডব চলছে, সেটাকে সত্য প্রমাণিত করা।

২. সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দমনে সহায়তাকারী সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করা।

৩. বিদেশী ঋণ সাহায্য বন্ধ করিয়ে দেওয়া এবং দেশীবিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশে ভয়ংকর অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

৪. ইয়াংকিবাদী-ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদী চক্রকে বাংলাদেশে হামলা চালানোর জন্য প্ররোচিত করা ও তজ্জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে ওরা খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারে।

এভাবে একটি গণনির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেওয়ার চক্রান্ত কি আসলে গণতান্ত্রিক? এভাবে ঋণসাহায্য, বিনিয়োগ ইত্যাদিকে বন্ধ করিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা হলে কি ১৪ কোটি মানুষের জীবনেই সীমাহীন দুঃখকষ্ট, অন্নাভাব ও অকালমৃত্যু নেমে আসবেনা? এর নাম কি জনগণের প্রতি ভালোবাসা? শুধুমাত্র বিদেশী মদদে গদী লাভের স্বার্থে ১০০% ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে মৌলবাদী নিদর্শন? বিদেশীদের বাংলাদেশে হামলা চালাতে প্ররোচিত করা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে আদপেই সংগতিপূর্ণ?

৮০. রবীন্দ্রথান ঠাকুরের ১৩৬ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে তদানীন্তন মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন, "আওয়ামীলীগের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রবীন্দ্র চেতনার ফসল।" ওবায়দুল

www.icsbook.info

কাদের বলেন "কবিগুরু এবং বঙ্গবন্ধু একবৃন্তে দু'টি ফুল।" কবীর চৌধুরী বলেন, "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাদেশ চেয়েছিলেন? বেদ-উপনিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথই কি তাহলে আমাদের জাতীয়তার উৎস?

৮১. সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদীদের মত যারাই ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান তারাই মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী। তাই এই চক্রের আঘাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। আপনারা যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদার তারাও ঠিক একইভাবে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরই মৌলবাদী-সন্ত্রাসীতো বলেনইনি, বরং তাদের মুসলমান হত্যা ও মুসলিম নারী ধর্ষণকে প্রকারান্তরে সমর্থনই করে গেছেন। আপনারা ২০০২ সাল ব্যাপী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও কখনো উচ্চারণ করেননি। ভারত যে তার ২ কোটি নাগরিককে গায়ের জোরে বাংলাদেশে পুশ আউট করে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতিকে বিপন্ন করে দিতে চাইছে, এব্যাপারেও আপনারা সম্পূর্ণ নীরব। মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী সম্পর্কে আপনাদের সজ্ঞা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডরত (জর্জ বুশ-এর ভাষায়) সামাজ্যবাদী-ইহুদিবাদী-হিন্দুত্ববাদীদের সংজ্ঞার হুবহু মিল কি প্রমাণ করে? এটা কি একথাই প্রমাণ করেনা যে, আপনার কোন না কোন স্বার্থে সামাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদীদেরই এজেন্ট বা প্রতিভূ হিসাবেই কাজ করছেন?

৮২. ক্ষমতায় আরোহনের তিন বছর পূর্তির প্রাক্কালে বিবিসিকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন যে, তিনি ৫৭ বছর বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। তিনি কি সত্যি কথা বলেছিলেন? এখন তাঁর বয়স কতো? তিনি কি সত্যিই রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন? এধরনের বক্তব্য বা স্টান্টের ব্যাখ্যা কি? এধরনের স্টান্ট ও মিথ্যাচারকে কি করে একজন শিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারেন?

৮৩. মার্কিন প্রেসিডেন্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ খ্রিষ্টান নেতা নেত্রীরাতো কখনোই নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে দাবী করেন না, বরং খ্রিষ্টান বলেই তাঁরা গর্ববোধ করেন। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী একজন অখ্রিষ্টান কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না; মার্কিন প্রেসিডেন্টকে শপথ নিতে হয় God-এর নামে এবং বাইবেল ছুঁয়ে, শপথখানা শেষ করতে হয় And, so help me God বলে, মার্কিন ডলারে লেখা থাকে In God We Trustn এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চালু আছে খ্রিষ্ট ধর্মের ওপর হামলাকারী বা বিরূপ সমালোচকদের দমনের জন্য Blaspheme আইন। কোন মার্কিন নেতা বা বুদ্ধিজীবী এগুলোকে মৌলবাদী বা সম্প্রদায়িক বলেন না। প্রোট্যাষ্টন্ট ব্যতীত কেউ ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী হতে পারেন না; এদেশেও আছে ব্লাসফেমী আইন ও বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদান। সুইডেনের

www.icsbook.info

সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, খ্রিষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে নেওয়া হলো, as adopted and explained in he unaltered Augsburg confession and in the resolution of Upsala synod. নরওয়ের সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লুথারবাদকে সেদেশের রাষ্টীয় আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপপ্রচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরই চতুর্থ অনুচ্ছেদে রয়েছে খ্রিষ্ট ধর্মের সংরক্ষণ ও হেফাজতের পূর্ণ নিশ্চয়তা: State shall always profess the Evangelical-Lutheran religion and maintain and protect the same. ডেনমার্কের সংবিধানের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে The king shall be a member of the Evangelical Lutheran church. সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের ৫১ নং অনুচ্ছেদে খ্রিষ্টবাদের নিন্দা সমালোচনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রীসের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) বলা হয়েছে, ওই রাষ্ট্রের সব কিছু করা হবে In the name of Holy consubstantual and invisible Trinity . আর্জেন্টিনার সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, To be eligible to the office of the President or Vice-President of the nation a person must have been born in Argentine territory and must belong to the catholic church. বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জিজ্ঞাসা, আপনারা কি উপরিউক্ত দেশ সমূহ বা তাদের সংবিধানকে মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলবেন? এসব দেশ ও সংবিধান যদি সাম্প্রদায়িক না হয়, তাহলে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, এই কথা দুটি থাকার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানইবা সাম্প্রদায়িক হবে কেন?

প্রসংগত আরো উল্লেখ্য, জাপানিরা বিশ্বাস করে জাপানের রাজবংশ সরাসরি স্বর্গ হতে আগত। নেপাল একটি বিঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র। দেশ, অবস্থান, পেশা নির্বিশেষে সকল ইহুদী ইহুদীবাদ (Judaism) ও জায়োনবাদের প্রতি শুধু নিষ্ঠাশীলই নয়, তারা এজন্য লড়াইও করছে শত শত বছর ধরে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানীসহ সেখানকার তাবৎ নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীই তাদের হিন্দুত্বের জন্য রীতিমত গর্বিত। থাইরাও বিশ্বাস করে তাঁদের রাজতন্ত্র ঈশ্বর নির্ধারিত। রাশিয়ার বর্তমান শাসকরাও খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। এরকম উদাহরণের অন্ত নেই। কিন্তু আপনারা, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরাই সম্ভবত-দুনিয়ার একমাত্র ব্যতিক্রম। আপনাদের মতে একমাত্র ইসলাম এবং ইসলামপন্থীরাই হলো মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, ঘৃণ্য ও নির্মূলযোগ্য; শুধু ইসলামের ওপর আঘাত হানাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। বিশ্বের নবীনতম ধর্ম ইসলামের বিরোধিতা করে বহু দেবদেবী অধ্যুষিত, মুর্তিপুজারী, ত্রিত্ববাদী প্রমুখের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধানিবেদনের নামই কি তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা? উপরোক্ত পটভূমিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের লোকেরা কোন যুক্তিতে বাংলাদেশের

www.icsbook.info

সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক বলেন? আপনারা মুসলিম নামধারীরাই বা কি যুক্তিতে তাদের অন্ধ সমর্থন ও উস্কানি প্রদান করেন?

৮৪. আপনাদের মতে তো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাটাই হলো গণতন্ত্র আর অন্যকেউ ক্ষমতায় থাকা মানেই স্বৈরতন্ত্র; নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জিতলেই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ, আর আওয়ামীলীগ হারলেই নির্বাচন স্থূল ও সূক্ষ্ম কারচুপির নির্বাচন, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ১০০% বাস্তবায়িত, আর অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উধাও, আওয়ামীলীগ করলে রাজাকারও মুক্তিযোদ্ধা আর আওয়ামীলীগ না করলে মুক্তিযোদ্ধাও রাজাকার, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আওয়ামীলীগের আঁতাত ও আশনাই জায়েজ, আর অন্য কারো সঙ্গে ওই দলের সমঝোতা নাজায়েজ। আপনাদের অর্থাৎ আওয়ামী নেতাবুদ্ধিজীবীদের কাছে এহেন তত্ব ও সংজ্ঞা অতি উচ্চ মার্গের সত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক বলে বিবেচিত হলেও, অন্যদের কাছে এসব তত্ব যে নিতান্তই আহম্মকীর সামিল, তা কি আপনারা কখনোই উপলব্ধি করবেন না? আপনারা কি কখনোই বুঝবেন না যে, আপনারা মানেই বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ নয়, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও নয়? বিএনপি ও ইসলামী দল সমূহসহ বহু সংগঠনের সমর্থকরা আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। আর যে বিশাল জনতা একবার আওয়ামী লীগকে আর এক বার বিএনপিকে ভোট দেয়, এই নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরাও আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন? তারা আপনাদের তত্বের ধার ধারেননা; তারা আওয়ামীলীগের ওপর বিরক্ত হলে বিএনপিকে ভোট দেন? আবার বিএনপির ওপর বিরক্ত হলে আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। এই সত্য আপনারা উপলব্ধি করেন কি?

৮৫. আর বাংলাদেশে আপনারা যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে দাবী করেন, যাঁরা এখনো কমবেশী কম্যুনিজম-সোশ্যালিজম-এর কফিন বহন করে চলেছেন, তাঁরা তো অনেক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ইসলামবিরোধীতার ক্ষেত্রে কার্যতঃ আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীদের লেজুড়বৃত্তিই করছেন বটে। আপনারা তো জানেন, প্রগতির অর্থ অগ্রগতি, বস্তুগত ও চিন্তাচেতনাগত উভয় ক্ষেত্রেই। সুতরাং, যে মতবাদ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ এবং তজ্জনিত কারণে সমাজ, বিশ্বব্যবস্থা ও বিশ্চচেতনার বিকাশ বা বিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম, সেই মতবাদকেই তো বলা যায় প্রগতিশীল। এতোদিন তো দাবী করা হতো যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসারীরাই প্রগতিশীল। কিন্তু ১০০% মহৎ উদ্দেশ্যের সততা সত্বেও কম্যুনিজমতো আজ কার্যত মৃত, তার অভ্যন্তরীণ ব্যধিরই কারণে। পুঁজিবাদী দুনিয়া সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের বদলে উল্টো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াইতো আপাততঃ আবার পুঁজিবাদে ফিরে গেছে। এমতাবস্থায়, সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ লেনিনবাদকেই শুধু প্রগতিশীল বলার কোনই কি আর বাস্তব ভিত্তি আছে? প্রগতিশীল কোন ব্যবস্থা বা আদর্শ কি

www.icsbook.info

এভাবে ডিফিটেড হতে পারে? এখনতো বাংলাদেশের সাবেক ও ম্রিয়মান (Moribund) সমাজতন্ত্রীরাও কার্যত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বা তাদের স্থানীয় দালালদের (Comprador) সাথেই ভিড়ে আছেন, বিশেষত বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে। আপনারাও আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের (এবং সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গেও) কণ্ঠমিলিয়ে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরই মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেছেন। এখন বলুন, ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে দুনিয়ার কোন দেশে আপনাদের কেউই ৭০ বছরও টিকিয়ে রাখতে পারলেন না, সেটাই প্রগতিশীল, আর যে মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থা ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ অবিকৃতভাবে টিকে রইলো এবং যা এখনো বিকাশমান, (২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯০ কোটিতে এবং এই প্রবৃদ্ধি অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রেই হবে না) সেই মতবাদই প্রতিক্রিয়াশীল, এ আপনাদের কেতনতরো যুক্তি? তাহলে কি প্রগতি ক্ষণস্থায়ী এবং প্রতিক্রিয়াশীল, চিরঞ্জীব? আপনারা বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি? Dialectics-এর মূলতত্ত্ব অনুযায়ী কোনটি প্রগতিশীল এবং কোনটি প্রতিক্রিয়াশীল? এর বস্তুবাদী বা Materialistic ব্যাখ্যাই বা কি?

৮৬. ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বছর আগে, ১৯২০ সালে। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি তার প্রতিষ্ঠার ২৯ বছরের মধ্যেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে। কিন্তু এই উপমহাদেশের, বিশেষত বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা প্রতি বছর খন্ডবিখন্ড হওয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে "সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর" জাতীয় গালাগাল করা ছাড়া আর কোন বাস্তব অবদানই রাখতে সমর্থ হয়েছেন কি? একমাত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিপ্লবী ফ্রন্ট ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য একটি দু:সাহসী, সংগ্রামী ও সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো বটে; কিন্তু একটি মাত্র টেকনিক্যাল স্কুল, অর্থাৎ জিয়াউর রহমানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসার ব্যাপারটি খেয়াল না করার দরুণই তাদের এই সঠিক উদ্যোগটিও অঙ্কুরেই ভেস্তে যায়। তাঁরা যদি সেদিন জিয়াকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে পারতেন, যা খুবই সম্ভবপর ছিল, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসই ভিন্ন হয়ে যেতো। পরবর্তীতে এই ভুলকে সামাল দেওয়ার জন্য তাঁরা ২৭ নভেম্বর কাউন্টার ক্যু-এর উদ্যোগ নেন, (যার ফলশ্রুতিতেই কর্নেল আবু তাহের বীরোত্তম-এর ফাঁসি হয়); ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে অপহরণের চেষ্টা করেন, সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যাকে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ বলে অভিহিত করেন এবং এদের পর এক ভুলের মাধ্যমে দ্রুত নি:শেষ হয়ে পড়েন। এ দেশের প্রগতিবাদীদের শতাব্দীর ইতিহাস নিলে দেখা যাবে যে, এঁরা ছিলেন আসলে বুলিসর্বস্ব প্রগতিশীল। সংগ্রামী মার্কসবাদী নন। বলুন, আপনাদের এই শান্তিনিকেতনী প্রগতিবাদ এদেশের মানুষকে শত বছরে কি দিয়েছে? আজ

www.icsbook.info

বাংলাদেশে যে কজন অবক্ষয়িত বা প্রায়-অবক্ষয়িত সমাজবাদী অবশিষ্ট রয়েছেন, তাঁরাও তো কার্যত মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বর্জন করে মার্কিনী মুক্ত অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদ-সামাজ্যবাদের সেবাদাসত্বেরই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। এই কি প্রগতির নমূনা? আপনাদের কম্যুনিজমের ধ্বংসপূর্বকালীন ৭০ বছরের ভূমিকাই কি প্রগতিশীল ছিল, নাকি বর্তমান ভূমিকা?

৮৭. এবার আসা যাক ইসলামের কথায়। ইসলাম জীবনাদর্শের কথা শুনলেই আপনারা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রবক্তাদের 'মৌলবাদী' 'রাজাকার আলবদর' ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে শুরু করেন। এতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান অনুপস্থিত অথবা নিতান্তই সীমিত। এটা সম্ভবত আপনাদের জানা নেই যে, খ্রিষ্ট, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের মত ইসলাম কতিপয় আচার অনুষ্ঠান, সদাচারের উপদেশ ও আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণীরই সমষ্টিমাত্র নয়। ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ব্যাপার। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। কুরআন ও হাদিসে রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি, বাণিজ্যনীতি, সম্পদের বন্টন নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে এবং সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা সকল কালের সকল মুসলমানের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠারজন্য এবং অন্যায় অবিচার শোষনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম বা জিহাদকেও। আপনারা হয়ত এটাও জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) শুধু একজন ধর্মপ্রবর্তক বা নবীমাত্রই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ, বিচারক, সমরবিদ ও সেনাপতিও। আর রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সকল দিকের অনুসরণও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। সর্বোপরি, এটাও আপনাদের জানা নেই যে, ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীকে সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পরিস্থিতিতে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিশ্বব্যবস্থার অগ্রগতির যে কোন পর্যায়ে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে, এর প্রয়োগিক রূপ নির্ধারণের জন্য রয়েছে 'ইজতিহাদ' 'ইজমা' ও 'কিয়াস'-এর ব্যবস্থা। আদর্শের কালোপযোগী প্রয়োগিক রূপ নির্ধারণের এমন বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মেতো দূরের কথা, অন্য কোন 'ইজম' এও আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত, চূড়ান্ত বিচারে ইসলামই বিশ্বের একমাত্র যথার্থ অসাম্প্রদায়িক,শোষণমুক্ত ও প্রগতিশীল ব্যবস্থা। অথচ আপনারা কুরআন হাদিসে বিধৃত রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানার এবং তার সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজবাদী ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারের কোন তোয়াক্কা না করেই অন্ধ একগুঁয়েমীর সঙ্গে বলেই চলেছেন যে, ইসলাম মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি। আপনাদের কেউ অন্ধ একগুঁয়েমীর সঙ্গে ১৮৪৮ সালে রচিত "কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো" বাংলাদেশে হুবহুব বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন এবং কিছুতেই বুঝতে চাননি যে,

www.icsbook.info

সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক অঞ্চল অধ্যুষিত বিশ্বপরিস্থিতিতে এবং ম্যাক্রো বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মার্কসবাদ বর্তমান মাইক্রো বিজ্ঞানের যুগে, ধ্রুপদী উপনিবেশের অস্তিত্বহীন এই আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে অপ্রতুল ও অকার্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা এটাও বুঝতে চাননি যে, এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুণই বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পিরামিড আপাতত: ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে। আবার আপনাদেরই একাংশ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন তোয়াক্কা না করেই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কিংবা লিংকনীয় গণতন্ত্র তথা বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে কার্যত কি দলবাজীসর্বস্ব স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদেরই অনুসরণ করছেন না?

এটা আপনারা উপলব্ধিই করতে পারছেন না যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো মাত্র। সুতরাং জাতীয় পুঁজিবাদী কাঠামো মজবুত না হলে অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন শক্তিশালী শিল্পপুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে না উঠলে এবং মোট জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান সিংহভাগ না হলে বুর্জোয়া বা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। সর্বোপরি, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের পক্ষেই শিল্পোন্নত দেশ সমূহ, তথা নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের চক্রান্ত ও স্বার্থের বলয় ভেদ করে জাতীয় পুঁজির পূর্ণ বিকাশ ঘটানোও মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। এটাও আপনারা আদৌ লক্ষ্য করছেন না যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে গণতন্ত্রের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দরুণই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বা লিংকনীয় গণতন্ত্র কোন না কোনরূপ বলবৎ আছে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশেই। শিল্পে পশ্চাৎপদ কোন দেশে ওই গণতন্ত্র কোনদিনই তেমন বিকাশ লাভ করেনি, করবেও না। আপনারাতো নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি শব্দ কতগুলো ইউনিভার্সাল দার্শনিক ক্যাটেগরি, এসব মনে রেখে এখন বলুন, সত্যিকার গোঁড়া, অন্ধ মৌলবাদী কারা? যারা কুরআন-হাদিসে বিধৃত জীবনদর্শন ও ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানার তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে ইসলামকে গালাগাল করছেন এবং বস্তুবাদী অগ্রগতির স্তর, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, আর্থসামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি বোঝার কোন ধার না ধেরে বিভিন্ন মুখরোচক ইজম বা মতবাদ অন্ধভাবে ১৪ কোটি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন, সেই একগুঁয়ে আপনারাই মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল? নাকি এরূপ গোঁড়ামী মুক্ত, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সতত খাপ খাওয়াতে সমর্থ ইসলামই মৌলবাদী? আপনাদের বিচারে কি সংজ্ঞা মৌলবাদের? কি সংজ্ঞা প্রগতির? কি সংজ্ঞা গণতন্ত্রের? এসব সংজ্ঞা আপনারা দর্শন বা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থে পেয়েছেন? ভালো কথা, কুরআনে যে, সাধারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার বাধ্যকতা আরোপ করা হয়েছে

www.icsbook.info

(সুরা বাকারা, ২১৫) শ্রমের মূল্য ব্যতীত কোন মানুষকেই অতিরিক্ত ভোগের অধিকার দেওয়া হয়নি (সুরা নজম, ৩৯), তা কি আপনারা জানেন? আপনারা কি জানেন হযরত উমর (রা:) কি আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন? আপনারা কি আবু যর গিফারী (রা:) ও ইবনে তাইমিয়ার অর্থনৈতিক দর্শন পড়েছেন? অনুগ্রহপূর্বক এগুলো পড়ে বলবেন কি কারণে, কেন বা কোনদিন থেকে ইসলামি ব্যবস্থা মার্কসীয় সাম্যবাদের চেয়ে নিকৃষ্টতর?

৮৮. স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর (Clash of Civilizations) গ্রন্থে ইসলামকেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের আদর্শিক প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত: সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বিশ্বে এখন ইসলাম ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন দর্শনেরই অস্তিত্ব নেই, যা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-আগ্রাসন-আধিপত্যের মোকাবেলায় বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষের সার্বিক মুক্তির হাতিয়ার হতে পারে। আপনারা ব্যাপারটা না বুঝলেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-জায়নবাদীরা এবং তাদের দার্শনিক ও মনীষীরা ঠিকই এটা উপলব্ধি করেছেন এবং তারা ইসলামকেই করেছেন তাঁদের আঘাতের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর দর্শন না হয়ে অন্যান্য ধর্মের মতো আচারের ব্যাপার মাত্র হলে সাম্রাজ্যবাদ-অধিপত্যবাদ-ইহুদীবাদের কোনই প্রয়োজন পড়তো না এর ওপর আঘাত হানার। বস্তুত, ইসলামের ওপর আঘাত হানার মাধ্যমে আপনারা আসলে কাদের পক্ষে কাজ করেছেন? কাদের কার্যসিদ্ধি করেছেন?

৮৯. পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের সঙ্গে অন্তরংগতা যদি খুবই অনভিপ্রেত ও অপরাধমূলক হয়, তাহলে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর তনয়ার অবস্থানকে আপনারা কিভাবে বিচার করবেন? প্রতিটি সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই জানেন যে, একাত্তুরে বাংলাদেশের ওপর নৃনংসতম হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়ার মূল হোতাই ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এই জুলফিকার আলী ভুট্টোই ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যাই নয়। বিশ হাজারের মত লোককে মারতে হবে এবং তাহলেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে" (জেনারেলস ইন পলিটিকস এয়ার মার্শাল আসগর খান, পৃষ্ঠা-২৮)। নগ্ন ক্ষমতালোলুপ ভুট্টো যদি সেদিন মদ্যপ ইয়াহিয়াকে উস্কে না তুলতেন, তাহলে পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামীলীগের হাতেই যথাসময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যেতো এবং মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের কোন প্রশ্নই উঠতো না। পাকিস্তানী নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, আরিফ ইফতিখার, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমূখও এই অভিমতই পোষণ করেন যে, পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য মূলত ভুট্টো-ইয়াহিয়াই দায়ী এবং একাত্তুরের যুদ্ধ তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। অধিকাংশ পাকিস্তানী জেনারেলের মতামতও একই

www.icsbook.info

রকম। এই ভূট্টো-ইয়াহিয়া চক্রই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে আশ্রয়-খাদ্য-নিরাপত্তা দিয়ে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে। ১০ লক্ষাধিক বাঙালীকে পাকিস্তানে আটকে রেখে, ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধুকে এই ভূট্টোই মুক্তি দিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুই একাত্তুরের গণহত্যার মূলনায়ক এই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য দাওয়াত দিলে, ১৯৭৪ সালের ২৪ জুন ভূট্টো ১০৭ জন সদস্যের এক বিশাল বহর নিয়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন এবং এই ভূট্টোকে বাংলাদেশে ইন্দিরা গান্ধীরই সমকক্ষ রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কন্যাও পাকিস্তান গিয়ে এই ভূট্টোকন্যার সঙ্গেই অন্তরংগ সম্পর্ক স্থাপন করে আসেন। অথচ তখন এই ভূট্টোকন্যার দলেরই শীর্ষতম নেতাদেরই অন্যতম ছিলেন ৭১-এর গণহত্যার দানব জেনারেল টিক্কা খান।

এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা সম্পর্কে আপনারা কি মূল্যায়ন করবেন? কি মূল্যায়ন করবেন বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা কর্তৃক পাক হানাদার বাহিনীর উচ্ছসিত প্রশংসার (আমার ফাঁসি চাই, মতিউর রহমান রেন্টু : ৯৮-১০০)? আসল কথা কি এই নয় যে, বস্তুত বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দলের কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা Ideology-ই ছিল না (৬-দফা কোন আদর্শ নয়, ৬টি দাবী মাত্র এবং এদলে ভারতপন্থী-মার্কিনপন্থী-পাকিস্তানপন্থী নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তর ও সার্থের মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। ৬ দফাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিংবা শোষিত মানবতার মুক্তির কোন সনদ ছিল না, এটি ছিল পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও আমলাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারা পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী পেটিবুর্জোয়া ও সামরিক বেসামরিক আমলাদেরই স্বার্থরক্ষার দাবী। বঙ্গবন্ধুই বা তাঁর পরিবারের সঙ্গেও ভূট্টো বা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখনই পশ্চিম পাকিস্তানে যেতেন, তখনই কোটিপতি ২২ পরিবারের অন্যতম হারুনদের বাড়ীতেই মেহমান হতেন, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন হারুনদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান; তাঁর ধানমন্ডির বাড়ীটিও ছিল সেই সূত্রেই লব্ধ; কোন অন্যায় বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত নয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ার পর অপ্রস্তুত-অসংগঠিত আওয়ামীলীগ নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ভারত যদি আশ্রয় না দিতো, তাহলে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর ভারতের অনুকম্পার কোনই প্রয়োজন হয়নি; তাঁর শারীরিক অস্তিত্বের জন্য তাঁকে খেতে হয়নি ভারতের নিমক। ফলে এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদাই দ্বিধান্বিত। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য ইন্দিরাজীর প্রতি এবং সপরিবারে জীবন রক্ষার জন্য ভূট্টোর প্রতি তাঁর ছিল প্রায় সমতুল্য কৃতজ্ঞতাবোধ এবং এজন্যই তিনি ইন্দিরাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সই করেছিলেন ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তিতে, আর ভূট্টোকে খুশী করার জন্য যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে

www.icsbook.info

এবং সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ইনষ্টিটিউশনালইজ বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এটাই কি আসল সত্যি নয়?

৯০. ভালো কথা, আপনারা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তিনদিকের তিন মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো এই তিনজনকেই বরণ করতে হয়েছে ইতিহাসের নির্মমতম মৃত্যু। এঁদের দু'জনের বুক সাবমেশিন গানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একজনকে লটকানো হয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠে। আপনারা কি বলতে চান, এই তিনটি নির্মম মৃত্যু নিতান্তই কাকতালীর ব্যাপার? শুধুমাত্রই কো-ইন্সিডেন্স? এর পেছনে প্রকৃতি ও ইতিহাসের কোন আপোষ নিয়ম বলবৎ নেই? কিছুই নেই এই তিনটি নির্মম মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেবার? যদি থাকে, তাহলে আপনারা কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন?

৯১. এ প্রশ্ন আপনারা অবশ্যই তুলতে পারেন যে, আমরা কি এই গ্রন্থে আওয়ামী লীগের বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দলবাজ, দুর্নীতিবাদ, স্বেরাচারী, ফ্যাসিবাদী, গদীলোলুপ, ভানসর্বস্ব (Pretentious) ইত্যাদি হিসাবে এবং তাঁদের প্রতিপক্ষ বিএনপি ও অন্যান্যদের দলবাজী মুক্ত, নিস্পাপ, গণতন্ত্রী, দেশপ্রেমিক, সততার প্রতীক ইত্যাদি হিসাবে প্রমাণ করতে চাইছি? মোটেই তা নয়। ১৯৭১-এ যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও হানাদারদের দোসর হিসাবে কাজ করেছিলো তাদেরকে দোষমুক্ত প্রমাণ করাও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। এই গ্রন্থে শুধু এ প্রশ্নই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আপনারা বিএনপি বা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেন, আপনারা নিজেরাই কেন সেইসব উপসর্গে নিমগ্ন হবেন? আপনারাও কেন অসততার আশ্রয় নেবেন? কেন আপনারাও গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করবেন? ক্ষমতার জন্য কেন এমন কাজ করবেন, যাতে দেশ ও জাতির চরম ক্ষতিই শুধু সাধিত হয়? কেন আপনারাও অর্থসম্পদের লোলুপতায় দূর্নীতি আত্মসাতের আশ্রয় নেবেন? কেন আপনারা বা আপনাদের নেত্রীও অশ্লীল বা অশালীন আচরণ করবেন? বিএনপি বা আপনাদের প্রতিপক্ষ খারাপ ও গণবিরোধী কাজ ও আচরণ করে, এই অজুহাতে আপনারাও যদি তাইই করেন, তাহলে আপনারা কিভাবে ওদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন? এদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও অভিজ্ঞ দল, তার প্রধান নেত্রী ও অন্যান্য নেতা-বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে আমরা কি নিরংকুশ শালীনতা, সত্যনিষ্ঠতা, মেধা, মনন, মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিকতা ও পরিমিতি বোধ বা Sense of proportion আশা করতে পারি যে, কেন আওয়ামীলীগ হবে তার প্রতিপক্ষের উল্টো পিঠ? কেন আওয়ামীলীগ আওয়ামীলীগ হবে না?

৯২. ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তার দোসর বৃটিশ সরকারের সহায়তায় ইরাকের ওপর হামলে পড়ে এবং তা দখল করে নেয়। এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ইয়াংকি প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ ও তার দোসর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি

www.icsbook.info

ব্লেয়ার যে অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছিলো, তা ছিলো সম্পূর্ণ ভূয়া, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর আগে তারা সন্ত্রাসের ধুয়া তুলে হামলা চালিয়েছিলো আফগানিস্তানে এবং সেখানে বসিয়ে দিয়েছিলো হামিদ কারজাই নামক এক তাঁবেদারের নেতৃত্বে একটি তাঁবেদার সরকারকে। বুশ ব্লেয়ারের এই মিথ্যাচার ধরা পড়ার পর তাদের স্ব স্ব দেশের জনগণই তাদেরই প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আপনারা কি ছবিতে দেখেছেন, ২০-১১-২০০৩ তারিখে জর্জ ডব্লু বুশ বৃটেন সফরে গেলে বৃটেনের জনগণ বুশের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিক্ষোভকারীরা লক্ষ লক্ষ ফেষ্টুন বহন করে, যার মধ্যে বুশের ছবির ওপর লেখা ছিলো WORLD'S NO. 1 TERRORIST অর্থাৎ বুশই দুনিয়ার এক নম্বর সন্ত্রাসী। বুশের কুশপুত্তলিকাও দাহ করে বৃটেনবাসী। অথচ বুশ-ব্লেয়ার চক্র বলছে মুসলমানরাই সন্ত্রাসী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে গড়ে ওঠে সাম্রাজবাদ-আগ্রাসনবাদ বিরোধী গণ প্রতিরোধ, ছড়িয়ে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের আগুন। এটা সকল বিচারেই সাম্রাজ্যবাদ-আগ্রাসনবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির গণপ্রতিরোধ, জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বাঁচার লড়াই। অথচ সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ এই গণপ্রতিরোধকেই বলে মুসলমানদের সন্ত্রাস। বাংলাদেশে আপনারাও তাইই করেন। তাহলে বুশ-ব্লেয়ারের ষ্ট্যান্ড এর সঙ্গে কি আপনাদের ষ্ট্যান্ড হুবহু মিলে যাচ্ছে না? মুসলিম অ্যাক্টিভিষ্টদের ভূমিকাকে মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে আপনারা কি আসলে সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-আগ্রাসনবাদের পক্ষেই অবস্থান নিচ্ছেন না? আপনারা কি খুবই সুনিশ্চিত যে আপনাদের এই ভূমিকা বাস্তবিকই প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

৯৩. তাসলিমা নাসরিন যখন 'নির্বাচিত কলাম; 'মেয়েবেলা' 'লজ্জা' 'অতলে অন্তরীণ' ইত্যাদি, লিখে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আঘাত হানেন, আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন, কুরআন সংশোধনের কথা বলেন এবং অশ্লীলতার নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটান, তখন আপনারাই তাঁকে 'মহিয়ষী', 'বীরাঙ্গণা', বিশ্বনায়িকা' ও 'দেবী বানিয়ে দেন। আর যেই তিনি 'ক' নামক আত্মজীবনী লিখে কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর চরিত্র উন্মোচন করে দেন, অমনি আপনারা সেই তাসলিমাকেই দেবীর আসন থেকে টেনে নামিয়ে হঠকারি, বদমায, বেশ্যা ইতর ইত্যাদি বলে গাল দেন। আপনারাই আগে বলতেন তাসলিমার মতো এমন বলিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, দু:সাহসী লেখকই আর হয়না। 'ক' প্রকাশের পর বললেন, তিনি লেখক নামেরই অযোগ্য। এখন বলুন, তাসলিমা সম্পর্কে আপনাদের কোন মূল্যায়নটি সঠিক? 'ক' লেখার আগের মূল্যায়ন? নাকি তার পরের মূল্যায়ন? ইসলাম মুসলমান ও আল্লাহর ওপর আঘাত হানলেই আপনারা পরমানন্দে ব্যোমকেশ, আর আপনাদের সম্পর্কে কিছু বললেই ক্ষেপে দিগম্বর। আপনাদের এহেন আচরণের ব্যাখ্যা কি?

www.icsbook.info

বস্তুগত ও ইতিহাসের সত্য

বস্তুতঃ ইতিহাসের বস্তুগত সত্য হলো নিম্নরূপঃ

• বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীদের অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে কখনোই কোন স্ববিরোধিতা ছিল না।

• বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সংগ্রাম ছিল অতুলনীয়, অসামান্য। কিন্তু এই অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে; যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁরও ছিল অসামান্য অবদান। এজন্যই তিনি ১৯৭১ সালে ৬ই মার্চ আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া। আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য" (পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোসাক, পৃষ্ঠা ৭১-৭২)। এজন্যই তিনি সিরাজুল আলম খান, আ স ম রবদের চাপ এড়ানোর জন্য সেই রাত্রেই পাকিস্তানী মেজর জেনারেল খাদিম রাজার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং এই আশ্রয় না পাওয়াতেই পরদিন (৭ মার্চ) উগ্রপন্থীদের মন রক্ষার জন্যই জীবনে শুধুমাত্র একবারের মতো বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু কখনোই চাননি পাকিস্তান ভাঙতে, কখনোই চাননি স্বাধীন বাংলাদেশ বা তার জন্য সংগ্রাম করতে এবং এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের মূল হোতাদের তিনি কোনদিনই পছন্দ করেননি। ৬ দফা প্রদান ও আগরতলা ষড়তন্ত্র মামলার জবানবন্দী থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের খতিয়ান নিলে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকান্ডই ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

• স্বভাবতই, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পেছনে সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ প্রমুখের জঙ্গী আবেগ ব্যতীত অপর কোন পরিকল্পনাই ছিল না। যুদ্ধের কোন প্রকার ষ্ট্রাটেজি, ট্যাকটিকস, চেইন অব কমান্ড, মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি কিংবা পশ্চাদপসারণের কোন পরিকল্পনার সার্বিক অনুপস্থিতিই তার প্রমাণ। এই পরিকল্পনাহীনতার জন্যই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোনরকমে ভারতে পাড়ি দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবদুল মালেক উকিল আগরতলায় পৌছেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁদের কোন নির্দেশই দিয়ে যাননি (জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৬-১৯৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০০) জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমুখ নেতারাও একই কথা বলেছিলেন (প্রাগুক্ত)। তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামও ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, মুজিবের আসল পরিকল্পনা

www.icsbook.info

সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না। (শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ পৃষ্ঠ-৩৫৪) অনেকে হয়তো বলবেন যে, সুন্দরী কাঠের লাঠি আর মরিচের গুঁড়া নিয়ে তৈরি হওয়ার জন্য তো বিচ্ছিন্নভাবে হলেও জাতির প্রতি আহবান জানানো হয়েছিলো। এরূপ ঘোষণার মধ্যে রোমান্টিকতা থাকলেও বাস্তবের লেশমাত্রও ছিলো না। সকলেই জানেন আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে, সেই গাদা বন্দুকের আমলেও তীতুমীররা যেখানে বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরেজদের সাদামাটা কামানের বিরুদ্ধেই টিকতে পারেননি, সেখানে আজকের যুগে মেশিনগান-রকেট-ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মরিচের গুড়া ব্যবহার করার পরামর্শ যে কি রকম উদ্ভট ও বালখিল্য ব্যাপার তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকারানহাস এরূপ প্রস্তুতি নিয়ে ইয়াহিয়া ভূট্টোর সাজানো আলোচনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে চূড়ান্ততম পর্যায়ের উজবুকী (Stupidity of the first order) বলে অবিহিত করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং অপর একজন বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কাছে স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের জন্য তাঁর কোনই প্রস্তুতি ছিলনা (Bangladesh Documents, Vol II. Page -615)। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর এই সরল স্বীকারোক্তির পর এব্যাপারে আর কোন কথাই থাকতে পারে না, থাকা উচিন নয়। এককথায়, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পেছনে কোন দল বা ব্যক্তির কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না।

• বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল ২৪ বছরব্যাপী পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর নির্মম উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, ৭১-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, নিরস্ত্র-অপ্রস্তুত জনগণের ওপর হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা, বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম নরহত্যা-ধর্ষণ-ধ্বংসযজ্ঞ, তরুণ-ছাত্র-যুবক ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের তুলনাবিহীন বীরত্ব, হানাদারদের বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র জনগণের প্রতিরোধ সৃষ্টি, ভারতের স্বার্থ ও ভূমিকা ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এব্যাপারে আওয়ামী লীগেরই সাবেক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. এ আর মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন, The military crackdown of 25th March was the final and decisive turning in the history of Bengali nationalism.. Until that date the nationalism that had developed and being represented by Awami League was seeking autonomy within the framework of Pakistan (History of Bangladesh: 1704-1971, Part 1, Dr. A. R Mullick and Syed Anwar Hossain. Page-572। সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই এ অঞ্চলের জন্য ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন চাইছিলেন এবং

www.icsbook.info

ইয়াহিয়া -ভুট্টো চক্রই হঠকারিতা ও ক্র্যাকডাউনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

• বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কোন ঘোষণাই দেননি। এরূপ ঘোষণা দেওয়ার কোন সুযোগও ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর দিবাগত রাত্রে তাঁর ছিলোনা। বঙ্গবন্ধু নিজেও তাঁর জীবনকালে কখনো দাবী করেননি যে তিনিই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর তথাকথিত ভক্তরাই নিজেদের কায়েমী স্বার্থে তাঁর ওপর এই "কৃতিত্ব" আরোপ করেছিলেন।

বস্তুতঃ হানাদার বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের পর প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তৎকালীন মেজর জিয়া, মেজর রফিক, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মীর শওকত আলী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মঞ্জুর, মেজর জলিল, মেজর নুরুজ্জামান, মেজর সি.আর.দত্ত, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী প্রমুখ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙ্গালী অফিসার ও জওয়ানরা। বাংলাদেশের ছাত্র-তরুণরা তাঁদের নেতৃত্বেই প্রথম সংগঠিত হন। পরবর্তীকালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ এবং জেনারেল সুজন সিং উবানের পরিচালনায় গঠিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (BLF) বা মুজিব বাহিনী। 'র' নিয়ন্ত্রিত এই বাহিনীর কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কিংবা প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী কিছুই জানতেন না; বা তাঁদের জানতে দেওয়া হতো না। এটি ছিল ভারতের একটি একান্ত নিজস্ব ও গোপন ব্যাপার। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী টগবগে তরুণরাও গড়ে তুলেছিল দুর্বার প্রতিরোধ। এরমধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনী। দলীয় নেতৃবৃন্দ ও আজকের উচ্চকণ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত ছিলেন কি? তাঁদের কেউ কেউ ভারতের নিরাপদ মাটিতে অর্থ, নেতৃত্ব ও ভারত সরকারের আনুকূল্য লাভের ধাক্কায় ব্যস্ত ছিলেন, আর কেউবা এখানে সেখানে চাকরী করেছিলেন মাত্র। অনেকে বাংলাদেশে থেকেই হানাদারদের মন যুগিয়ে স্ব স্ব চাকরী বা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

• বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা করুন বা না করুন, তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ। তাঁর সুবিশাল ভাবমূর্তিই মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল, আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আপামর জনগণকে প্রেরণা আর সাহস যুগিয়েছিল। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিলো অসামান্য।

• ভারত যদি সেদিন পলায়নপর নেতাকর্মীদের আশ্রয় না দিত, তাহলে যে সাংগঠনিক ও সামরিক প্রস্তুতি মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদারদের ছিল, তাতে একমাসের মধ্যেই তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হানাদার বাহিনীর পক্ষে

www.icsbook.info

আদৌ কষ্টসাধ্য হতো না। তারপর হয়তো বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা, জওয়ান ও তারুণ্যের সংমিশ্রণে নতুননেতৃত্বে গড়ে উঠতো, দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঘটতো, বাংলাদেশের আপামর জনগণ সত্যিকার অর্থেই মুক্তির স্বাদ পেতে পারতো। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে, আর যাঁরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব কুক্ষিগত করতে চাইছেন তাঁদের অস্তিত্বতো নিঃসন্দেহেই মুছে যেতো। এদিক থেকে, বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতার জন্য ভারতের ভূমিকা ছিল অসামান্য। কিন্তু ভারত সেদিন পলায়নপর বাঙালীদের আশ্রয়, অস্ত্র ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি কোন মমত্ববোধ থেকে নয়, বরং ভারতেই নিরংকুশ স্বার্থবোধ থেকে। হিন্দু ভারত তাদের মুসলিম প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে ধ্বংস বা হীনবল করার এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লগিয়েছিলো। বিজয়ের পরপরই প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল ইত্যাদি থেকে শুরু করে গঙ্গা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণ, বঙ্গসেনা ও শান্তি বাহিনী সৃষ্টি, অপারেশন পুশ ব্যাক, বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণতকরণ ইত্যাদিই ভারতের নির্মম সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার প্রমাণ।

• মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে যখন প্রতিটি সেক্টরে সংশ্লিষ্ট অধিনায়কের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং হানাদারদের অনেকটা কাবু করে আনে, ঠিক তখনই নেতৃত্ব ও স্বার্থ হাতাছাড়া হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, কোলকাতায় অবস্থান সর্বস্ব আওয়ামীলীগ সরকার ভারতের সাথে একটি দাসত্ব মূলক ৭-দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১. যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধু তারাই, প্রশাসনিক কর্মকর্তাপদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

২. বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ১৯৭২ সালের নবেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এসম্পর্কে পুননীরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে বহুবছর থাকবে।)

৩. বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

৪. অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৫. সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

www.icsbook.info

৬. দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলাবাজারে (ওপেনমার্কেট)-এর ভিত্তিতে। তবে বানিজ্যের হিসাব হবে বছরওয়ারী এবং যার যা পাওনা তা ষ্টার্লিং-এ পরিশোধ করা হবে।

৭. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

এই চুক্তির ফলেই মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভারত সরকার ও ভারতীয় জেনারেলদের করায়ত্তে এসে পড়ে এবং বাংলাদেশকে ভারতের সরাসরি উপনিবেশে পরিণত করার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তণ দিল্লী মিশন প্রধান হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর উপস্থিতিতেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং স্বাক্ষরদানের পরপরই সৈয়দ নজরুল মূর্চ্ছা যান (বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে 'র' এবং সি. আই. এ" মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা-৬৬)

• প্রবাসী আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে, বাংলাদেশের কারো কাছে নয়। এই চুক্তির বলেই ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আটকে রেখেছেল ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তির বলেই হানাদারদের পরাজয়ের পর পর বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এক একজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে। বিজয়ের পরপর ভারত যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়, তখন এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযোদ্ধাদের আর কিছুই করার ছিলো না। এই চুক্তির বলেই ভারত বাংলাদেশ সরকারকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩০০০ হানাদার সৈন্যকে অবলীলায় পাকিস্তানের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই চুক্তির জোরেই ভারত দিল্লীভিত্তিক যৌথ পাট কমিশন গঠনের মাধ্যমে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে নেয়।

• বঙ্গবন্ধু কখনোই এই ভারত-কেন্দ্রিক, ভারত ভিত্তিক ও ভারত নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেননি। এ জন্যই তিনি সত্বরতার সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশের মাটি থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। (বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের দরুণ তখন বাংলাদেশের মাটি থেকে বিদায় করে নিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের দরুণ তখন প্রতিবাদ না করলেনও পরবর্তীকালে বহু ভারতীয় নেতা, এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পর্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন যে, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা ভারতের জন্য একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল)। এজন্যই বঙ্গবন্ধু অতি অপমানজনক ৭-দফা চুক্তি মেনে চলতে রাজী হননি, যার

www.icsbook.info

ফলে পরবর্তীতে ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময় তুলনামূলকভাবে কম অপমানজনক ও মোটামুটি সমতাভিত্তিক ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এজন্যই বঙ্গবন্ধু ২৫/৩/৭১ থেকে ১৬/১২/৭১ পর্যন্ত সময়ের কোন ঘটনার কথা কোন গণমাধ্যমে প্রচার হতে দেননি। এজন্যই তিনি কোনদিন যাননি মুজিবনগরে, কাউকে যেতেও দেননি সেখানে। এজন্যই তিনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারিত করেছিলেন। এজনই তিনি পাকিস্তানপন্থী খোন্দকার মোশতাককে আওয়ামী লীগ ও বাকশালের শীর্ষ নেতৃত্বে বহাল রেখেছেন। এজন্যই বঙ্গবন্ধু ভারতের ক্ষোভ-উষ্মার তোয়াক্কা না করে ১৯৭৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং এজন্যই তিনি ১৯৭৪ সালেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশের মাটিতেই ইন্দিরা গান্ধীর সমকক্ষ সম্বর্ধনা প্রদান করেছিলেন।

• আজ যে দল ও গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সমস্ত কৃতিত্ব আত্মাসাৎ করতে চাইছে, এই দল ও গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় বা জেলা পর্যায়ের কোন নেতা বা সাংসদই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেয়নি। বাংলাদেশের অকুতভয় তরুণ ও জওয়ানরা হানাদারদের মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন এঁদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে জীবন যৌবনকে উপভোগ করছিলেন এবং সম্পদ ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ব্যস্ত ছিলেন। সাহিত্যিক-চিত্র-পরিচালক জহির রায়হান এঁদের ভারতে অবস্থান-কালীন যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রামাণ্য চিত্র তুলে আনেন এবং তাইই সম্ভবতঃ হয়ে দাঁড়ায় বিজয়ের ৪৫ দিন পর (৩০/১/৭২) তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ। তাঁর দালিলিক ফিল্মের রিল সমূহও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কেউই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁরা ঢাকা শহরেরই স্ব স্ব বাসাবাড়ীতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন; অনেকে কাজ করে যাচ্ছিলেন সংবাদপত্রে, অনেকে ক্লাস নেওয়ার জন্য রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতও শুরু করে দিয়েছিলেন। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁদের মৃত্যু ছিল তাঁদেরই পরম নিশ্চেষ্টতা ও হানাদার নির্ভরতারই প্রায়শ্চিত্তেরই শামিল।

• পাকিস্তানী হানাদার ও এখানে বসবাসরত বিহারী-অবাঙ্গালীদের পরই যারা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিল, তারা হলো রাজাকার আলবদর বাহিনী। আর এই ঘৃণ্য পৈশাচিক বাহিনী সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে বঙ্গবন্ধুর আমলেও উচ্চতর সরকারি পদে সমাসীন ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদও একথা তাঁর" ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টসঃ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড" গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এইসব বাহিনীর বাঙালী নেতা ও সদস্যদেরও বঙ্গবন্ধুই ঢালাওভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে তারাও লাভ করেছিলো

www.icsbook.info

মুক্তিযোদ্ধাদের সমান নাগরিকত্ব। বঙ্গবন্ধুই রাজাকার আলবদরদের পূনর্বাসিত করেছিলেন।

প্রথমে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ১৫০০ জন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সদস্যকে। পরে এই সংখ্যা কমিয়ে ১৯৫ জনে স্থির করা হয়। কিন্তু মূল যুদ্ধপরাধীদের একজনেরও বিচার করা সম্ভবপর হয়না। কারণ ভারত বাংলাদেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা না করে সিমলা চুক্তি মোতাবেক ওই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩০০০ পাকিস্তানী হানাদারকেই পাকিস্তানের হাতে প্রত্যার্পণ করে দেয়। মূল যুদ্ধাপরাদীদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি জারি করা হয় দালান আইন। এই আইনে মোট ৩৭,৪৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৮৪৮ জনের বিচার হলে আদালত দেখতে পান যে, এদের ২০৯৬ জনই সম্পূর্ণ নির্দোষ। এটা দেখে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত সকলকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দেন। দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়। এভাবে দালাল আইন বাতিল বা রাজাকার আলবদরদের আইনগতভাবে পূনর্বাসনের ব্যাপারে জিয়াউর রহমান বা অন্য কারো কোনরূপ ভূমিকা ছিলোনা। রাজাকার আলবদরদের শাস্তি না হওয়ার দায় আওয়ামীলীগারদেরই।

• ১৯৭০-এর নির্বাচনের বিজয়ের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু তারা না তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তালিকা, না তৈরি করে শহীদদের তালিকা। বরং জেনারেল ওসমানী ও স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম উদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত মুক্তিযুদ্ধের সনদসমূহ বিলি করে দেয়া হয় মুড়িমুড়কির মতো, টোটকা ঔষধের বিজ্ঞাপনের মতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, পৃথিবীর প্রতিটি বিপ্লব বা রক্তাক্ত সংগ্রামের পর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ অনিবার্য হলেও, বাংলাদেশে আদৌ তা করা হয় না। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশে কি করবে, তার কোন তোয়াক্কা না করে সেই উপণিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রতিরক্ষা কাঠামোকেই পুনর্বহাল করা হয়। ফলে দিগদর্শনহীন মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ সম্পদ আহরণে নেমে পড়ে, কেউ সামান্য জীবিকার সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরতে থাকে, কেউ মুটে-মজুর রিক্সাচালকে পরিণত হয়, কেউ যোগ দেয় সরকার বিরোধী রাজনীতিতে। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই হয়ে পড়ে অসহায় বেকারত্বের শিকার। পাক হানাদারদের হাতে ধর্ষিতা লক্ষ লক্ষ তথাকথিত "বীরাঙ্গণাদের" পূনর্বাসনের জন্যও কোনরূপ ব্যবস্থাই হয় না। তারামন বিবি বীর প্রতীকের মতো মুক্তিযোদ্ধা রমণীদেরও অন্যন্যোপায় হয়ে বেছে নিতে হয় দাসীবৃত্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এইরূপ বৈরী

www.icsbook.info

আচরণ রাজাকার-আলবদরদের ভূমিকার চাইতেও ছিল বেশি ক্ষতিকর। বিশ্বের ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এ রকম আচরণের দ্বিতীয় কোন নজীর নেই।

• বিজয়ের পরপরই মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদাররা পরিত্যক্ত সমস্ত শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট, বাড়ীঘর, গুদাম ইত্যাদি দখল করে নেয়। শুরু হয় লুটপাট ও পারমিটবাজীর এক বর্বর অধ্যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফ আসে, তার শতকরা ৮০ ভাগই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আত্মসাৎ করে, বাংলাদেশের পাট ভারতে পাচার করে শূন্য গুদামের পর গুদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতে থাকে। ঐ নৈরাজ্য ও লুটপাটের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বিশ্বের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে এসব দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও লুটপাটের খবর। বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন, "চাটার দল সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে"। হেনরী কিসিঞ্জার ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে এক তলাহীন ঝুড়িতে"। এভাবে জন্মলগ্নেই বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর যে আঘাত হানা হয়, তার রেশ আজও কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। কবে যে হবে তাও কেউ বলতে পারে না।

• এসব লুটপাট ও আত্মসাতের বিরুদ্ধে যাতে কেউ টু শব্দটি উচ্চারণ করতে না পারে, তার জন্য গঠন করা হয় লাল বাহিনী, রক্ষী বাহিনী (৭.৩.৭২) প্রভৃতি গেষ্টাপো বাহিনী। এদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয় প্রতিবাদী মুক্তিযোদ্ধারা। এসব বাহিনী ও সরকার দলীয় গুন্ডাদের হাতে জাসদ ও সর্বহারা পার্টির হাজার হাজার নেতা কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়। পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের সহযোগি রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাতে যে পরিমাণ মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়, এসব গেষ্টাপো বাহিনীর হাতে নিহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল তার তুলনায়ও বেশি। এসব হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে কোন থানাকে কোন মামলাই নিতে দেয়নি তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের বাহিনী সমূহ।

• মুজিববাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না। এজন্য তিনি কোনদিনই মুজিববাদ সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভট সংমিশ্রণে তথাকথিত মুজিববাদ তৈরি করেন এবং এর দায়দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর ওপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধুকে তুষ্ট করার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাওয়ায়, "মুজিববাদ"-এর এককালের উন্মত্ত ধারকবাহকরাও আজ আর মুজিববাদ সম্পর্কে কোন কথাই বলেন না। এখন তাঁরা মার্কিনী ধাঁচের মুক্তবাজার অর্থনীতিরই অগ্রসৈনিক।

www.icsbook.info

• বঙ্গবন্ধুর একমাত্র দুর্বলতা ছিল এই যে, তিনি তাঁর দলের নেতা কর্মীদের আপন প্রাণের চাইতেও ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার জন্যই তিনি তাদের যাবতীয় অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারেননি। এই উদারতার জন্যই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "এতদিন অন্যেরা খাইছে, এইবার আমার লোকেরা খাইব"। তাঁর এই উদারতাই পরিণত হয়েছিল তাঁর নিমেসিসে।

• দলীয় নেতা কর্মীদের চক্রান্ত, শ্বেতসন্ত্রাস ও লুটেরা কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিতে ইতিমধ্যেই অনেকখানি ধ্বস নেমে এসেছিল। কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন কায়েমী স্বার্থবাদীরা লুটপাটের অবাধ অধিকার, লুটপাটলব্ধ সম্পদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে চিরকালের উদার গণতন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে কায়েম করিয়ে নিয়েছিল একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা, যা ছিল হিটলার মুসোলিনীর নিরংকুশ নাৎসী স্বৈরাচারেরই হুবহু প্রতিকৃতি। এর শ্লোগানও ছিল ঠিক অদ্রুপ। এদের শ্লোগান ছিলো "এক নেতা এক দেশ; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ"। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সদস্যদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে বাধ্য করা হয়। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের অধিকার। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই তারা মহাপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিরই কফিনে এঁটে দেয় সর্বশেষ পেরেক।

• এই পটভূমিতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত ভক্ত প্রগতিবাদী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদার নেতা-বুদ্ধিজীবীরা তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এই নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৫ জন লোকের একটা মিছিল পর্যন্ত বের করে না। তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বাধীন রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটা বুলেট পর্যন্ত ছোড়ে না। তৎকালীন সেনাপ্রধান ও পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ নেতা কে এম সফিউল্লাহ নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থারই উদ্যোগ নেন না। বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত ভক্ত অনুসারীরা বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীর সিঁড়ির ওপর ফেলে রেখেই নতুন সরকারের মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ করেন।

• বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন অসাধারণ সংগঠক ও আবেগ প্রবণ জননেতা (Demagogue)। কিন্তু তিনি ততোটা ভালো রাষ্ট্রনায়ক বা প্রশাসক ছিলেন না। একারণে তাঁর জন্য যথার্থ ছিলো সরকারে না থেকে দলীয় প্রধান হয়ে থাকা, সরকারের গার্জেনের ভূমিকা পালন করা, মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় থাকা। কিন্তু

www.icsbook.info

একাধারে গান্ধী নেহরু বা মাও সেতুঙ-চৌএলাই হতে গিয়েই তিনি পরিণত হন এক ফ্যাসিষ্ট একনায়কে এবং স্বভাবতই বরণ করেন ফ্যাসিষ্ট একনায়কদের অমোঘ পরিণতি।

• খোন্দকার মোশতাক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দল ও মন্ত্রীসভারই সর্বোচ্চপর্যায়ের নেতা। খোন্দকার মোশতাকের মন্ত্রীসভার প্রতিটি সদস্যও ছিলেন আওয়ামীলীগ বাকশালেরই সদস্য। তাঁর পার্লামেন্টও ছিল ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুরই পার্লামেন্ট। এক কথায়, খোন্দকার মোশতাকের সরকার ছিল সর্বাংশেই আওয়ামীলীগ বাকশালেরই সরকার। ওই সরকারের সদস্য ও সহযোগীদের অনেকে পরবর্তী কালেও আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বে আসীন ছিলেন। ওই সময়কার যেই স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল বঙ্গবন্ধুকে ফেরাউন বলে অভিহিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে আওয়ামী বাকশালীরা সেই আবদুল মালেক উকিলকেই সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত করেন। ওই সরকারের সদস্য/সহযোগী আবদুল মান্নান, মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখও বহাল ছিলেন আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতা হিসাবে।

• বঙ্গবন্ধুর প্রতি একচ্ছত্র ভক্তির দাবীদাররাই ১৯৭৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রণয়ন ও জারি করেন কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, যাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হতে না পারে এবং তাঁদের সম্পদ ও ক্ষমতা নিরাপদ ও অব্যাহত থাকে। এই অর্ডিন্যান্সটি তৈরি করেন শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীমনোরঞ্জন ধর।

• বাংলাদেশে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদার, তাঁদের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো (ক) অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষ (খ) অন্ধ ভারত প্রীতি (গ) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ধারক হিসাবে নিজেদের জাহির (ঘ) অশ্লীল সংস্কৃতির অনুসৃতি এবং (ঙ) বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অতুলনীয় ভাবমূর্তিকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার।

• এঁদের যুক্তি হলো ভারত ও ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যেহেতু উগ্র ইসলাম বিরোধী, সেহেতু উগ্র ভারত ও ভারতীয়রা যা কিছুই করে, তাইই প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও উচ্চ সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা গত ১৯৪৭ থেকে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রায় ১৮০০০ টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা, কয়েক লক্ষ মুসলমান হত্যা, হাজার হাজার মসজিদ-মাযার জবরদখল, মুসলমানদের চাকরী, ব্যবসা, জমি ইত্যাদি থেকে নির্মমভাবে হঠিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বঙ্গসেনা বীর বঙ্গ ও শান্তিবাহিনী পোষণ, অপারেশন পুশ ব্যাক, বাংলাদেশকে পানি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিতকরণের পরিকল্পনা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি সি আর দত্তবাবুদের আহবান ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ও উগ্র সমর্থন প্রদান করেন।

www.icsbook.info

• বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের পটভূমিতে ইসলামই বিশ্বের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সার্বিক জীবনাদর্শ বিধায়, আজ ইসলামই হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আঘাতের মূল লক্ষ্য। স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর clash of Civilazations গ্রন্থে দেখিয়েছেন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদভিত্তিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইসলাম। অতএব, এই সভ্যতার অগ্রদূত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার প্রমুখ এবং ভারতে হিন্দুত্ববাদীর কোন বিশ্বাসযোগ্য অজুহাতেরও তোয়াক্কা না করে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছেন মুসলমানদের ওপর। বাংলাদেশে এই আঘাত হানার সর্বাত্মক দায়িত্ব নিয়েছেন স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদার এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-প্রগতিবাদীরা। তারা ক্রমাগত প্রচার করে চলেছেন যে, ইসলামই যত নষ্টের গোড়া, ইসলামপন্থীরাই দেশ ও জাতির যাবতীয় দুর্দশার জন্য দায়ী, ইসলাম মৌলবাদী এবং ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। বস্তুতঃ শোষক গোষ্ঠীর ২৪ বছরব্যাপী উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলূমের মুক্তির যুদ্ধ, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিলো সম্পূর্ণ ন্যায়যুদ্ধ, যদিও এক শ্রেণীর অন্ধ দালাল ইসলামপন্থীরা এর বিরোধীতা করেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে-মাজারে-খানকায় হানাদারদের ধ্বংস ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের জন্য দোয়া মোনাজাতও করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব নেতা বুদ্ধিজীবী যুদ্ধের ময়দানের ধারে কাছেও ছিলেন না, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলেন, সরকারি উদারতা-দুর্বলতার সুযোগে তাঁরাই পরবর্তীতে হঠাৎ ব্যাঙের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব লুণ্ঠন করার স্বার্থে ইসলামের ওপর আঘাত হানার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠেন।

• ড. আহমদ শরীফদের মতো অবশ্যই যে কেউ ইচ্ছে করলেই নাস্তিক হয়ে যেতে পারেন, ইসলাম ধর্মও ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু কোন একটা বিষয়, আদর্শ বা ধর্মকে না জেনে তাকে নিয়ে তামাসা করাটাই হচ্ছে আপত্তিকর। অথচ, দেখা যায় যে, উন্মত্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবদীরা জানেন না এবং জানার কোন তোয়াক্কাই করেন না যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, কুরআন-সুন্নাহর রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে এবং তা পুংখানুপুংখরূপে মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক, (আবার বলছি, বাধ্যতামূলক)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন রাষ্ট্র প্রধান, সেনাপতি, সমরবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, আইনদাতা ও বিচারকও এবং তাঁর সকল দিকের অনুসরণও প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। তদুপরি, ইসলামে রয়েছে ইজতিহাদ, ইজমা ও কিয়াসের

www.icsbook.info

ব্যবস্থা, যার ফলে যে কোন দেশে যে কোন যুগে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির যে কোন স্তরে কুরআন সুন্নাহর শাশ্বত মর্মবাণীর প্রয়োগিক রূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর (বিশ্বের অন্যকোন মতবাদ বা ইজমেই এমন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই)। এই জন্যই ইসলাম, তার মূলনীতির কোন রদবদল ব্যতিরেকেই, ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ অবিকৃতভাবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি, ইসলাম গ্রহণের হারও অন্য যেকোন ধর্মগ্রহণের হারের তুলনায় ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। অথচ এই কালোত্তীর্ণ কোন দুঃখে ইসলামকেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী এবং অন্য সকল ধর্ম, মতবাদ ও চিন্তাধারাকেই বলেছেন ধর্ম নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। বস্তুতঃ প্রগতি, প্রতিক্রিয়া, মৌলবাদ ইত্যাদির সংজ্ঞাও এরা কতোটা জানেন, তা বলা মুস্কিল।

• এঁরা আরও জানেন না যে, ইসলাম একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, সমস্ত সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদে আল্লাহর সকল বান্দারই সমান অধিকার; মানুষকে শোষণ করার কোন এক্তিয়ার কোন মানুষের নেই। আল্লাহ বলেছেন, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর আধিপত্য তথা ব্যক্তি বা জাতির ওপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একনায়কত্ব/স্বৈরাচার ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অমুসলমানের ওপর কোন প্রকার নিপীড়ন, শোষণ বা হয়রানিও সম্পূর্ণরূপেই ইসলামবিরুদ্ধ। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং যে বিচারব্যবস্থায় ধনী বা প্রতিপত্তিশালীরা ধন বা প্রভাবের বিনিময়ে আপীলের সুযোগ ও আদালতের রায় কিনে নিতে পারে সেই বিচার ব্যবস্থা ইসলামে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। সুতরাং এটাই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত যে, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই না জেনে এবং জানার কোন তোয়াক্কাই না করে অন্ধভাবে ইসলামের ওপর আঘাত হেনে চলেছেন এবং অন্ধভাবে ভারত ও হিন্দুত্ববাদীদের যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের এই অন্ধত্বতারই নাম হলো প্রতিক্রিয়াশীলতা। প্রচলিত অর্থে এই অন্ধত্বতারই নাম হলো মৌলবাদ। আর যদি মৌলবাদের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং কোন জীবনদর্শনের মূলধারা বা মূলনীতির অসুরণকেই "মৌলবাদ" বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে তো কার্লমার্ক্সের মূলমন্ত্রের অনুসারীরাও মার্কসীয় মৌলবাদী, মুক্ত অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরাও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী মৌলবাদী এবং অন্ধ ভারত ভক্তেরাও ভারতপন্থী হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী।

• কোন আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কর্মসূচিকে ওই আদর্শ নিয়ে ব্যবসা। একথা বলা যায় না। যেমন, কেউ যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের জন্য ওয়েস্ট মিনিস্টার বা লিংকনীয় গণতন্ত্রই সর্বোত্তম এবং সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য

www.icsbook.info

সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তাহলে তিনি বা তাঁরা গণতন্ত্র নিয়ে ব্যবসা করছেন একথা বলা যাবে না। একই বিচারে যাঁরা কুরআন সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে বদ্ধপরিকর, তাঁরাও ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছেন না। বরং ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছেন তারাই, যাঁরা বাস্তবিকই ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের ওপর সর্বময় বেপরোয়া আঘাত হানেন, অথচ নির্বাচন এসে পড়লেই জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ধর্মের কথা বলেন, হজ্বে, উমরাহ হজ্বে চলে যান, মাযার জিয়ারত শুরু করেন, লোক দেখানো নামায পড়েন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ, জাতীয় শ্লোগান ও জিগির তোলেন, ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁরাই, যাঁরা অষ্ট প্রহর ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপ-উপহাস করেন, নামায-রোজাকে ব্যঙ্গ করেন, অথচ রমযান মাস এলেই "ইফতার পার্টির" প্রতিযোগিতা শুরু করেন। মার্কসবাদের অনুসরণ যদি মার্কসবাদকে নিয়ে ব্যবসা না হয়, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসরণ যদি ওই গণতন্ত্রকে ইসলাম বা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা হতে যাবে কেন? নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা যখন উমরাহ করেন, মাথায় পট্টি বাঁধেন, তাসবিহ জপেন মাযার জিয়ারত করেন তখন তাঁকে কি বলবেন? বস্তুতঃ রাজনৈতিক কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও স্বয়ং শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের মুলধারাও নামায-রোজা-হজ্ব সব ইসলামী বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই প্রতীয়মান হয়।

এটা একটা অতি নিম্ন স্তরের স্ববিরোধিতা যে, ধর্মনিরপেক্ষতা অষ্টপ্রহর ইসলামের বিরোধিতা করেন; অথচ তাঁদের মৃত্যু হলে তাঁদেরও জানাজা, কাফন, কুলখানি সবই হয়। এটা ভন্ডামী, কাপুরুষতা নাকি উভয়ের সংমিশ্রণ, তা জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই ভালো জানার কথা।

● একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের নিযুত জোয়ান ছাত্র জনতা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ৩০ লক্ষ না হলেও লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিল তাদের প্রাণ। লক্ষ মা বোন দিয়েছিল তাদের ইজ্জত। গোটা জাতি রুখে দাঁড়িয়েছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে। এতো অল্প সময়ে এতো বেশি প্রাণ আর রক্তদানের দ্বিতীয় কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এই তুলনাবিহীন ত্যাগ তিতিক্ষা এবং রক্ত ও প্রাণদানের লক্ষ্য ছিল শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতির কবল থেকে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মুক্তি এবং এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের একক ও একমাত্র চেতনা। কিন্তু এ বিষয়ে কারুরই দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই যে স্বাধীনতার সুদীর্ঘ তিন যুগ পার হলেও মুক্তিযুদ্ধের এই সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও চেতনা আদৌ অর্জিত হয়নি। বরং আপামর জনগণের অবস্থার আরও শোচনীয় অবনতি ঘটেছে; শোষণ বৈষম্য সন্ত্রাস নৈরাজ্য দূর্নীতি আজ সমগ্র জাতিকে গ্রাস করেছে, মূল্যবোধকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, ঝাঁঝরা করে দিয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-

www.icsbook.info

প্রশাসনিক ইনষ্টিটিউশনকে। আর জাতির এই চরম বিড়ম্বনার মূল্যে গড়ে উঠেছে একচেটিয়া সম্পদ ও ক্ষমতা ভোগকারী একটি শক্তিশালী মাফিয়াচক্র। গত তিন যুগের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এতোদিন যাবৎ যে ধরনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশে চলে এসেছে, তার মাধ্যমে সমগ্র জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জন কোনদিন কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। কারণ এই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার না আছে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ, না আছে কোন মিশন (Mission), ভিশন (Vision) ও গোল (Goal)। অতএব জাতির সার্বিক মুক্তি অর্জন করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনার যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে সমৃদ্ধি ও শোষণমুক্তি সুনিশ্চিত করতে হলে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন এমন দল ও নেতৃত্ব যাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও চরিত্র আছে, আছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী, মিশন, ভিশন ও গোল।

অথচ আপনারা যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (অর্থাৎ ধর্মহীনতাবাদী) এবং স্বাধীনতাও মুক্তিযুদ্ধের সকল কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদার, তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্বরে বলবেন যে, ওপরের সমস্ত কথাগুলোই মিথ্যে। বস্তুতঃ বাস্তবে যা ঘটেছে বা ঘটছে, তা কখনোই আপনাদের বিচারে সত্যিকার ইতিহাস নয়। মহাকবি বাল্মিকীর রামায়ণ রচনার মতো, আপনাদের কাছে সত্যিকার ইতিহাস হলো সেটাই, যেটা আপনাদের স্বার্থ, গোয়ার্তুমি ও অহং এর অনুকুল, তা আদৌ বাস্তব কি অবাস্তব, তাতে কিছুই যায় আসেনা।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমাদের আগে পরে পৃথিবীর বহুদেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বহুদেশে সম্পন্ন হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু এইসব স্বাধীনতা ও বিপ্লবে দলবিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা নিয়ে কখনোই কোন মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়নি। কারো পছন্দ হোক বা না হোক, আমেরিকার স্বাধীনতা থেকে শুরু করে মেসিডোনিয়ার স্বাধীনতা, লেনিনের রুশ বিপ্লব থেকে শুরু করে ইমাম খোমিনীর ইসলামী বিপ্লব পর্যন্ত কোন ইতিহাস নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষ কোন দিনই কোন দ্বিমত পোষণ করেনি; কারণ বাস্তবে যা ঘটেছিল তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের ইতিহাস। দ্বন্দ্ব শুধু সৃষ্টি হয়েছে আপনারা যে ইতিহাস চাপিয়ে দিতে চাইছেন, সেই ইতিহাস নিয়েই। স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও আপনাদের গন্ডীর বাইরের কাউকেই গ্রহণ করানো সম্ভবপর হয়নি আপনাদের "ইতিহাস"। কারণ আপনারা যেটাকে ইতিহাস বলে চালাতে চাইছেন, দেশের অন্তত ৭৫% মানুষের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই "উদ্দেশ্যমূলক অলীক গল্প"।

কিন্তু জাতিতো প্রজন্মোর পর প্রজন্ম এই বিভ্রান্তির বোঝা বহন করতে পারে না। ইতিহাসের স্বার্থে, প্রজন্মের স্বার্থে এবং সর্বোপরি নিরংকুশ সত্যকে (Absolute

www.icsbook.info

truth) কে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থেই এর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়া অত্যাবশ্যক। নির্ণীত হওয়া অত্যাবশ্যক, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাস্তবিকই কোন দল এবং কোন ব্যক্তি কি ভূমিকা পালন করেছেন, কারা বিজয়ের পর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, কারা সৃষ্টি করেছে ৭৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, কারা সশস্ত্র বাহিনীসমূহের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে এবং রাজনীতিতে অংশ নিতে বাধ্য করেছে, কারা একদলীয় সরকার কায়েম করেছে, কারা ভারতের সংগে ৭১-এ সম্পাদন করেছিল চূড়ান্ততম অধীনতামূলক ৭ দফা চুক্তি, কারা প্রণয়ন ও জারি করেছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, কারা ৩৩ বছর যাবৎ বাংলাদেশের স্বার্থকে বলি দিয়েছে বিদেশী স্বার্থের যুগকাষ্ঠে, কারা দেশের ৮৭% মানুষকে ঠেলে দিয়েছে করুণ মানবেতর জীবন যাপনে, কারা বঙ্গসেনা ও শান্তিবাহিনীকে সমর্থন ও উৎসাহ যোগাচ্ছে, কারা উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মরুভূমি করার চক্রান্তে নীরব মদদ যোগাচ্ছে, কারা নীরব সমর্থন দিচ্ছে গুজরাটসহ ভারতব্যাপী মুসলিম গণহত্যাকে, কারা সমর্থন দিচ্ছে ২ কোটি ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইন করার ব্যাপারকে, কারা মদদ যোগাচ্ছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ইসলাম বিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতি, কারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছে বিশ্বের ১নং দূর্নীতিবাজ দেশে, কারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদীদের দেশ হিসাবে প্রমাণ করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে, কারা সত্যিসত্যি ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করেছে, কারা বঙ্গবন্ধুর নাম ও ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করছে নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থের ধর্ম ও হাতিয়ার হিসাবে।

বস্তুত: যে পর্যন্ত এ সমস্ত বিষয় সুস্পষ্ট না হবে, সে পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি কিছুই স্বচ্ছ হবে না; ১৪ কোটি মানুষ মুক্ত হবে না শোষণ, বৈষম্য, প্রবঞ্চনা, ভন্ডামী, সন্ত্রাস ইত্যাদির কবল থেকে; দেশ মুক্তি পাবে না আগ্রাসন ও স্নায়ুযুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে; বাস্তবায়িত হবে না মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা, শোধ হবে না মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের আর রক্তের ঋণ।

আমরা আশা করি, দেশ ও জাতিকে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও সংশয়ের কবল থেকে মুক্ত করার আপনারাও আপনাদের সত্যিকার অবয়ব স্বচ্ছ সুস্পষ্টভাবে জনতার আদালতে তুলে ধরবেন। তারপর, জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে, শতকরা ৮৭ জন মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে আল্লাহর বিধিবিধান থাকবে নাকি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতারই (অর্থাৎ ধর্মহীনতারই) প্রতিষ্ঠা ঘটবে। জনগণই স্থির করবে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ১৪ কোটি মানুষকে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করে যে ধরনের রাজনীতি, ইজম ইত্যাদির এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে সেই এক্সপেরিমেন্টের

www.icsbook.info

প্রক্রিয়াই বহাল থাকবে, নাকি বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণ নিশ্চিত সার্বিক মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।

বস্তুত, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং অবর্ণনীয় জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন এই ভূখন্ডের জনগণের স্বাধিকার আদায়েরই জন্য। বিদ্রোহে ম্যাগনা কাটা (১২১৫ খ্রিষ্টাব্দ) যে ভূমিকা পালন করেছিলো, তাঁর ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তুরের গণ আন্দোলন, উনিশ'শ সত্তুরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরংকুশ বিজয় ইত্যাদি ঘটনা যদি না ঘটতো, তাহলে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিই আদৌ তৈরী হতোনা এবং ওই সময়ে সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নও আসতোনা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি স্বশরীরে অংশ না নিলেও, তিনিই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যের প্রতীক, প্রেরণার উৎস এবং মনস্তাত্বিক একচ্ছত্র নেতাও। একাত্তুরের ৭ মার্চ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণও নি:সন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তার পরিবারের কোন কোন সদস্য, আত্মীয় স্বজন ও দলীয় লোকেরা যাইই করুকনা কেন, ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অর্থনৈতিক লোভলালসার উর্ধে। জননেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য অসাধারণ। তাঁর দেশপ্রেমও ছিলো প্রশ্নাতীত। চল্লিশের দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কর্মকান্ড ও ভূমিকার মধ্যে কোনই অসংগতি ছিলোনা। বলাবাহুল্য এই সব গুণাবলীই যে কোন ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসে অক্ষয় করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বঙ্গবন্ধুকেও।

কিন্তু তাঁর একশ্রেণীর অতিভক্ত ও অতিউৎসাহী সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা তাঁর ওপর ভগবান সুলভ সর্বকৃতিত্ব ও সর্বগুণাবলী আরোপ করতে গিয়েই তাঁকে অনাহুতভাবে বিতর্কিত করে তোলেন। গোটা জাতির বঙ্গবন্ধুকে পরিণত করেন শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের বঙ্গবন্ধুতে।

বঙ্গবন্ধু অবশ্যই এই ভূখন্ডের জনগণের স্বাধিকার, সার্বিক কল্যাণ ও আর্থসামাজিক মুক্তি চেয়েছিলেন। এই তিনি তা চেয়েছিলেন অন্য যে কারো চাইতে বেশি আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার সাথেই। কিন্তু সেটা তিনি চেয়েছিলেন অখন্ড পাকিস্তানেরই কাঠামোর মধ্যেই, তাঁর ম্যাগনা কার্টা ৬-দফার ভিত্তিতেই। আমাদের মতো যাদের বিরল সৌভাগ্য হয়েছিলো তাঁর কাছাকাছি যাবার, তাঁদের সকলেই জানেন যে, বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করতেন যে ইসলামাবাদে একবার আওয়ামীলীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তথা চীফ এক্সিকিউটিভ হয়ে বসলেই, তিনি ও তাঁর সরকার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে অবশ্যই সমর্থ হবেনই; আর ৬-দফা বাস্তবায়িত হলেই পাকিস্তান পরিণত হবে একটি কনফেডারেশনে এবং কোন রক্তক্ষয় ছাড়াই বর্তমান বাংলাদেশ

www.icsbook.info

নামক ভূখন্ডের জনগণ পেয়ে যাবে তাদের সকল অধিকার। এজন্যই বঙ্গবন্ধু শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে পরম ধৈর্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি পাকিস্তানী হানাদারদের অপারেশন সার্চলাইট শুরুর দেড় ঘন্টা আগেও ড. কামাল হোসেনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন পরদিন, ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনার কর্মসূচী ঠিক আছে কিনা। এজন্যই তিনি বিরত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান থেকে।

বঙ্গবন্ধুর ট্র্যাটেজি, ধারণা বা চিন্তার সঙ্গে কেউ একমত না হতে পারেন। কিন্তু তাঁর সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাহসের ব্যাপারে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কখনোই ছিলোনা। কারো মত বা পথ ভিন্ন হলেই যে তিনি মানুষ হিসাবে কম মহান বা কম শ্রদ্ধেয় হবেন, এ ধারণা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। লেনিন, মাওসেতুঙ,, চার্চিল, গান্ধীজী বা সুভাষ বোসের পথের সঙ্গে কেউ ভিন্নমত পোষণ করলেই কি এসব ক্ষণজন্মা পুরুষ অমহান বা অশ্রদ্ধেয় হয়ে যাবেন? ইতিহাস তাঁদের অবমূল্যায়ন করবে? অবশ্যই নয়। বঙ্গবন্ধু খন্ডিত পাকিস্তানের বদলে অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে এই অঞ্চলের জনগণের মুক্তি চেয়েছিলেন বলে তাঁর মহত্ব ও বিশালত্বইবা খাটো হয়ে যাবে কেন? এই জাতির জন্য তাঁর দরদ, মুক্তি আকাংখা ও সংগ্রাম কি কোন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কোন অংশেই খাটো ছিলো? জওহর লাল নেহেরু গান্ধীজীর কুটির শিল্পভিত্তিক চরকা অর্থনীতির পথ কখনোই গ্রহণ করেননি, তিনি গিয়েছিলেন ব্যাপক আধুনিক শিল্পায়নের পথে, যার ফলশ্রুতি আজকে উন্নত ভারত। কিন্তু নেহেরু গান্ধীজীকে কখনোই অশ্রদ্ধা করেননি, যতোদিন গান্ধীজী জীবিত ছিলেন, ততোদিন নেহরু সবরমতি আশ্রমে গিয়ে নিত্য তাঁকে প্রণাম করে এসেছেন।

আমি তারস্বরে দাবী করি যে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ হালের কোন আওয়ামীলীগের বা তাঁর অতিভক্তদের তুলনায় একরত্তিও কম নয়, বরং বেশিই। আমি শুধু বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, তিনি যা ছিলেন, ততই তাঁর সর্বোচ্চ সন্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া যথেষ্ট; তিনি যা ছিলেননা বা যা তিনি করেননি তা তাঁর ওপর আরোপের প্রচেষ্টা তাঁকে শুধু খাটো ও বিতর্কিত করে তুলতেই বাধ্য। ১৯৭২ থেকে এবাবৎ হয়েছেও তাই। এ অপপ্রয়াস আত্মঘাতি। এর কোন প্রয়োজন নেই।

এভাবে আরোপ করতে গিয়ে কি রক্ষা করা গেছে খোন্দকার ইলিয়াসদের প্রণীত মুজিববাদকে? বাকশালকেও কি টেকানো গেছে শেষ পর্যন্ত। যার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে এযাবৎ কালীন সমস্ত মহৎ সৃষ্টি ও কাজের স্থপতি বা স্বপ্নদ্রষ্টা একমাত্র বঙ্গবন্ধুই, তাও কি দেশের সকল মানুষ অবলীলায় গ্রহণ করেছে? আওয়ামী লীগ দু'বার ক্ষমতায় থেকেও কি এটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? পেরেছে

www.icsbook.info

ইতিহাসকে বিতর্কমুক্ত করতে? বরং বঙ্গবন্ধুর ওপর সর্বকৃতিত্ব আরোপ করতে গিয়ে এবং তাঁকে একচ্ছত্র রাখার উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমানের ওপর আঘাত হানতে গিয়ে কার্যত আওয়ামীলীগাররাই কি তাঁদের প্রতিপক্ষীয়দের প্রতিনিয়ত উস্কে দিচ্ছেননা বঙ্গবন্ধুর প্রতিও অশালীন কটাক্ষ ও সমালোচনা করার জন্য? এভাবে সবকৃতিত্ব আরোপ করতে গিয়ে যে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিনিয়ত বিতর্কে টেনে আনা হচ্ছে, এতে কি বঙ্গবন্ধুর আত্মা সত্যিই খুব শান্তি পাচ্ছে?

একইভাবে শেখ হাসিনা সম্পর্কে যে সমালোচনাই থাকনা কেন, এই সত্য কি করে অস্বীকার করা যাবে যে, তিনি শুধু আওয়ামীলীগেরই প্রধান নন, তিনি বাংলাদেশেরও সাবেক প্রধানমন্ত্রী (হয়তোবা ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীও) এবং অন্যতম প্রধান জাতীয় নেত্রীও বটে? অথচ বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে যা হয়েছে, একইভাবে শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও হচ্ছে তাইই করার অপপ্রায়স। একশ্রেণীর নেতা বুদ্ধিজীবী উস্কানি দিয়ে তাঁকে কি বাধ্য করছেন না মুখরা, অশালীন ও জিঘাংসাপরায়ণ হতে, যা তাঁর অবস্থান ও মর্যাদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক? বাধ্য করছেনা তাঁকে উগ্র একদেশদর্শী হতে? এতে জাতির কি লাভ হচ্ছে? চূড়ান্ত বিচারে কি লাভ হচ্ছে বরং শেখ হাসিনা বা আওয়ামীলীগেরও? কি প্রয়োজন শেখ হাসিনাকে সক্রেটিস, গান্ধী বা মাদার তেরেসার সমকক্ষ বলার? কি প্রয়োজন তাঁর জন্য অর্থহীন ১১টি অনারারী ডক্টরেট সংগ্রহের? কি প্রয়োজন তাঁর নামে রাষ্ট্রীয় ভবন বঙ্গভবন বরাদ্দের?

যেহেতু শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অন্যতম অবিসংবাদিত নেত্রী, সেহেতু তাঁর সম্মান অবশ্যই সমগ্র জাতির সম্মান, তাঁর অসম্মানও অবশ্যই সমগ্র জাতিরই অসম্মান।

আমার প্রতিপাদ্য মোটেই এ নয় যে, আওয়ামীলীগের তুলনায় আওয়ামী বিরোধীরা অধিকতর সৎ, অধিকতর দেশপ্রেমিক কিংবা শাসক হিসাবে অধিকতর দক্ষ। তাঁরা যে আওয়ামীলীগারদের চেয়ে কোন অংশেই কম দূর্নীতিপরায়ণ বা কম দলবাজ এই আস্ফালনেও জনগণ খুব একটা বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ। বস্তুত, মার্কস এঙ্গেলস লেলিনের সকল তত্ত্বই ভুল ছিলো না। তাঁরা সমাজের যে শ্রেণী বিশ্লেষণের তত্ব দিয়ে গেছেন, তা কখনোই ভুল প্রমাণিত হয়নি, কখনোই হবেনা। মার্কসীয় শ্রেণী বিশ্লেষণ অনুযায়ী শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণীস্বার্থের বিচারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষের আদৌ কি কোন তফাৎ আছে? মানুষগুলো ভিন্ন হলেও উভয় পক্ষই আসলে একই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ নন? তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলগত চরিত্রও কি প্রায় হুবহু একই রূপ নয়?

বঙ্গবন্ধু অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ৬-দফা ভিত্তিক কনফেডারেশন চেয়েছিলেন, এই বক্তব্যের দ্বারা আমি একথাও প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিনা যে, জিয়াউর রহমানই মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার একচ্ছত্র স্থপতি ছিলেন।

www.icsbook.info

আমি ভালো করেই জানি যে ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন তরুণ মেজর মাত্র। তিনি তখন এখানকার ৮ কোটি জনগণেরও নেতা ছিলেন না, ছিলেননা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কও। সুতরাং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বময় নেতা বা সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের অবস্থান থেকে এবং অথরিটি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করারও তাঁর কোন কারণ বা সুযোগ ছিলো না। কারো কারো মতে তিনি কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে যে ঘোষণাটি পড়েছিলেন অন্য কাউকে দিলে অন্য কেউও সেটা পড়তে পারতেন। বস্তুতঃ চূড়ান্ত অর্থে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঘোষণার পাঠক। তিনি এটা পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই।

কিন্তু তাই বলে জিয়াউর রহমানকেও খাটো করার কোনই অবকাশ নেই। এটাও কিছুতেই অস্বীকার করা যাবেন যে, তিনি যে হিসাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করুননা কেন, এই ঘোষণা গোটা জাতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অবস্থান ও দিকনির্দেশনা তৈরী করে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধেরও তিনি ছিলেন এক অসম সাহসী সেনানায়ক। তিনিই বাংলাদেশের দু'টি বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠনের একটি গঠন করে গেছেন, যা বঙ্গবন্ধু ব্যতীত আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ যেমন বঙ্গবন্ধু, বিএনপির প্রাণপুরুষও তেমনি জিয়াউর রহমানই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তৈরী হয়েছিলো তাঁর একটি চমৎকার গ্রহণযোগ্যতা। অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাঁর নির্লোভতা ছিলো কিংবদন্তীর মতো। জনগণের বিপুল অংশের অন্তরেও তাঁর ইতিবাচক স্থান না থাকলে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল বারংবার গণ ভোটে জিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাচ্ছে কি করে?

বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের মধ্যে কার চেয়ে কে বড়ো, এ প্রশ্ন যেমনই অযৌক্তিক, তেমনই অর্বাচীন। এঁদের দু'জন সম্পূর্ণরূপেই দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। দু'জনের গঠন বা গ্রুমিং ভিন্ন। মাও সেতুঙ ও দেং জিয়াও পিং দু'জনই মহাচীনের দুই যুগ স্রষ্টা, কিন্তু দু'জনের অবস্থান ভিন্ন। একইভাবে অবস্থান ভিন্ন মালয়েশিয়ার টুংকু আবদুর রহমান ও মাহাথির মোহাম্মদের। একই কথা প্রযোজ্য বিসমার্ক ও উইলী ব্রান্ট এর ক্ষেত্রেও।

এক কথায়, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুই। জিয়াউর রহমানও জিয়াউর রহমানই। দু'জনের তুলনা অবাস্তব, আপ্রয়োজনীয়, অসমীচীন।

ইতিহাসের নিজস্ব গতি ও নিয়ম আছে। অতএব, কেউ হাজার চেষ্টা করলেও বঙ্গবন্ধুর যে অবস্থান প্রাপ্য, সেই অবস্থান থেকে তাঁকে এতটুকু নীচে নামাতে পারবে না। পারবেনা এতটুকু ওপরে ওঠাতেও। এমতাবস্থায়, তাঁর ব্যাপারে আরোপ বা হেয়করণ কোনটিরই কি প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে?

www.icsbook.info

আর এস এস-এর মিশন

ভারতের রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আর.এস.এস) আরব বিশ্বে কর্মরত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দিতে লিখিত দু'টি লিফলেট বিলি করে। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

১. পৃথিবী থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা,

২. মহা-ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করা এবং

৩. কা'বা শরীফকে মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করা।

"রামজীর জয় হোক" শিরোনামে প্রকাশিত এই লিফলেটে বলা হয়েছে, "৬ ডিসেম্বরের (বাবরী মসজিদ ধ্বংসের দিন– পরে এখন শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে আরব ভূমিতে পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের লক্ষ্য অর্জন করার সময় এসেছে। দেশ ও বিদেশের সব বন্ধু বান্ধব আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন ঘৃণ্য মুসলমানদের মসজিদের হাত থেকে দেবতা রামের পবিত্র জন্মভূমিকে উদ্ধার করার মহান কাজে। একইভাবে আমাদেরকেও বিদেশের সেসব বন্ধুদের ইসরাইলকে মহা ইসরাইলে পরিণত করার জন্য এক হয়ে শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করতে হবে।

"আরব দেশগুলোতে অবস্থানরত আমাদের সব হিন্দু ভাইদের কাছে ইতিমধ্যেই 'প্রয়োজনীয় পরামর্শ' সম্বলিত সার্কুলার দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। এতে যে কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে, তা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করে হুবহু বাস্তবায়নের জন্য আমরা সকল রামভক্তের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। নিম্নবর্ণিত উপদেশগুলো চরম সতর্কতার সাথে এবং যথাশীঘ্র পদক্ষেপের মাধ্যমে মেনে চলতে হবেঃ

১. আরব দেশে অবস্থানকালে আমাদের দলের প্রতীক বা নাম কোথাও ব্যবহার করবেনা।

২. দলের সব সার্কুলার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সব ভাইয়ের কাছে পৌছাতে হবে।

৩. আরব জগতে কর্মরত সব ভারতীয় মুসলমানদের নামের তালিকা ও তাদের চাকরি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যসহ 'এরিয়া ক্যাডার চিফ' কে সরবরাহ করুন। এদের উপর কড়া নজর রাখুন। আমাদের স্বার্থবিরোধী কিছু ঘটলে কিংবা দরকারী তথ্য পেলে তা ইতিমধ্যেই আরব দেশগুলোতে নিয়োজিত আমাদের 'ক্যাডার চিফ'কে জানিয়ে দিন।

৪. স্থানীয় আরবদের সাথে গভীর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বজায় রেখে ওদের দুর্বলতার পুরো সুযোগ নিন। সুন্দরী নারী, মদ ও অর্থ হচ্ছে দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সেগুলো ব্যবহার করুন।

৫. আরব জগতে অবস্থানকালে আপনার কর্মস্থল, বাসগৃহ দোকান, অফিস, সর্বত্র রামের মূর্তি (ছোট বা বড়) স্থাপন করুন। তা সম্ভব না হলে অন্তত রামের একটি ছবি রাখুন। কারণ আরব হচ্ছে রামজীর আসল আবাসভূমি। ১৪০০ বছর আগে ঘৃণ্য এসব মুসলিম তাকে এখান থেকে হটিয়ে দিয়েছিল।

www.icsbook.info

"মনে রাখবেন, চলতি শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই রাম রাজত্বের স্বপ্ন এবং বৃহত্তর ইসরাইলের আকাংখা পূরণ হওয়া উচিত। এ সময়ের মধ্যেই ভারত ও আরব দেশগুলোকে ঘৃণ্য মুসলমান জাতি, তাদের মসজিদ, সংগঠনসহ সবকিছু থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। শুধু রামের ভক্তরাই ভারত ও আরবে গর্বের সাথে বাস করার অধিকার রাখে। বিশেষ করে জঘন্য মুসলমানরা, কেবল রামের ও রামভক্তদের ক্রীতদাস হিসেবেই বাঁচতে পারে।

মহাপ্রভু রামের জয় হোক। আমাদের মাতৃভূমির জয় হোক।"

'রক্ষাকর, ধর্ম রক্ষা কর' শীর্ষক অপর প্রচারপত্রটির অন্তত ১৫টি কপি তৈরী করে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে পৌছে দিতেও বলে দেয়া হয়েছে।'

এই লিফলেটে বলা হয়েছে, "প্রতিটি হিন্দুর জেগে ওঠার সময় এসেছে। গরুখোর মাংসভূক বন্য পশু শয়তানদের ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে শুধু নির্দোষ মানুষকে হত্যা করতে এবং গণহত্যা চালাতে। তারা শত শত বছর ধরে নিজ মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে খুন করছে। শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া ইসলামের নির্দেশ। মুসলমানরা আবার হিন্দু ধর্ম ও ভারতের ধ্বংস করার মতলবে ইসলামের নামে গোপনে তৈরী হয়েছে। তাদের সাহস খুব বেশি। তাদের শয়তানী শ্লোগান 'আল্লাহ্ আকবর' আমাদের দেশে ধ্বনিত হচ্ছে। মহান হিন্দুধর্মকে বাঁচানোর জন্য এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য তাদের পিষে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের উপর আবার তারা বদনজর ফেলেছে। একারণে তাদের চোখ নষ্ট করে দিতে হবে।

"এসব পশুর ভয়ে আমরা কি ঘরে চুড়ি পরে মেয়েদের মতো বসে থাকবো? হিন্দুরা কি নপুংশক? না। শিবাজী ও মহারানা প্রতাপের মহাপবিত্র রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত। আমরা এসব মহাপুরুষের সন্তান। হিন্দু বাবার রক্ত দেহে থাকলে, হিন্দু মায়ের স্তন্য পান করলে মহাপবিত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য হিন্দুরা প্রস্তুত হও। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের সম্পূর্ণ পতন ঘটাতে হবে। অতএব, ওঠো জাগো। "হর হর মহাদেব" শ্লোগান দিয়ে জেগে ওঠো। ইসলামী পশুদেরকে, গরুখোর গোষ্ঠিকে আক্রমণ করে পাইকারীহারে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করে দাও। তাহলেই কেবল রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে"

বলাবহুল্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, বিজেপি, কর সেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং, প্রভৃতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ প্রমুখ দেশেবিদেশে এধরনের প্রচন্ড প্রতিহিংসামূলক মুসলিম বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একচ্ছত্র দাবীদাররাও নাকি এদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করছেন।

www.icsbook.info

শেখ হাসিনার সাথে বিবিসি সাক্ষাৎকার

বিবিসির বিখ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমান ও জন রেনারের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং সিরাজুর রহমানঃ

১৯৮৮ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে বিবিসি অফিসে বসে টেলিফোন পেলাম। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক (পরবর্তী মন্ত্রী) মিঃ তোফায়েল আহমেদ বললেন যে, শেখ হাসিনা আমার সাথে কথা বলতে চান। সাথে সাথেই শেখ হাসিনার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন শেখ হাসিনা?" তিনি বললেন, কেমন থাকবো! আমাকে খুন করার জন্যে ওরা গুলি চালিয়েছে। পরবর্তী কথোপকথন ছিল মোটামুটি নিম্নরূপঃ

সিরাজুর রহমান- শেখ হাসিনা, কে গুলি চালিয়েছে আপনার ওপর?

শেখ হাসিনা- কে গুলি চালিয়েছে সেটা আপনি বোঝেন না?

সিরাজুর রহমান- শেখ হাসিনা, আপনি একটু পরিস্কার করে বললে সুবিধা হয়।

শেখ হাসিনা- কে আর চালাবে? এরশাদ চালিয়েছে। আমাকে খুন করার জন্য।

সিরাজুর রহমান- এ ঘটনা কোথায় ঘটেছে, শেখ হাসিনা? আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

শেখ হাসিনা– ঘটবে আর কোথায়? রাস্তায়।

সিরাজুর রহমান– আপনার গায়ে গুলি লাগেনি তো? আপনার কোন ক্ষতি হয়নি তো?

শেখ হাসিনা– না, না। কিন্তু আমার গাড়ির কয়েক গজের ভিতর গুলি পড়েছে।

সিরাজুর রহমান- সরু রাস্তার মধ্যেও গুলি কয়েক গজ দূরে পড়েছে, এমন আনাড়ি ঘাতক পাঠালো এরশাদ আপনাকে খুন করার জন্যে?

শেখ হাসিনা- আমার কোন কথায় বিশ্বাস করেন না আপনি । আপনি আমার বিরোধী।

সিরাজুর রহমান- শেখ হাসিনা, শান্ত হোন .....কিন্তু ততক্ষণে শেখ হাসিনা টেলিফোন মি. তোফায়েল আহমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

১৯৮৮ সালেই শেখ হাসিনা লন্ডনে এসেছিলেন। বিবিসিতে আমরা (সিরাজুর রহমানরা) তাঁর জন্যে উপস্থিত মতো একটি সংবর্ধনার আয়োজন করি। যুক্তরাজ্যের আওয়ামীলীগ কর্মী আতাউর রহমান খান, এ এইচ জোয়ার্দার, সুলতান শরিফ এবং অন্যদের সাথে নিয়ে তিনি বুশ হাউসে এসেছিলেন। বিবিসি'র দু'একজন পরিচালক, সম্পাদকীয় বিভাগের কিছু কর্মকর্তা এবং বাংলা বিভাগের সহকর্মীদের সাথে আমি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ষ্টুডিওতে আমি বাংলায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ইংরেজী অনুষ্ঠানের জন্যে একই ষ্টুডিওতে ইংরেজীতে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন সহকর্মী জন রেনার। এ জন্য রেনার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, শেখ হাসিনা, আপনি তো বেশ কিছুদিন আওয়ামীলীগের নেত্রী হয়েছেন, বলুন তো নেত্রীত্ব এবং রাজনীতি আপনার কেমন লাগছে?

www.icsbook.info

শেখ হাসিনা –রাজনীতি আমার মোটেই ভাল লাগে না। আসলে আমি রাজনীতিকে ঘৃণা করি।

জন রেনার– তাহলে রাজনীতিতে এলেন কেন?

শেখ হাসিনা -এসেছি আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবো বলে।

এরকম সময়ে ইশারায় জন রেনারের অনুমতি নিয়ে আমি রেকর্ডিং থামিয়ে দিলাম। শেখ হাসিনাকে বললাম যে, তাঁর এই উক্তি প্রচারিত হলে রাজনীতির দিক থেকে তাঁর অসুবিধা হবে, কেননা তাঁর পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশবাসী তাঁকে ভোট দেবে বলে আশা করা উচিত হবে না। শেখ হাসিনা তখন নতুন করে সাক্ষাৎকার শুরু করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছিলেন বলে মনে হয়নি।

১৯৮২ সালে এক সফরে লন্ডনে রিজেন্টস পার্কের কাছাকাছি এক বাংলাদেশী রেস্তোরাঁয় শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন দিয়েছিলেন। আরো অনেকের মতো আমিও (সিরাজুর রহমান) গিয়েছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সরকার, বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কড়া সমালোচনা করছিলেন। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্র জ্যোতি বসুর একটি সাক্ষাৎকারের কথা তখন আমার মনে পড়ে গেল। সে সাক্ষাৎকারে আমি জ্যোতি বসুকে হলদিয়ার পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প নিয়ে দিল্লির কেন্দ্র সরকারের সাথে রাজ্য সরকারে বিরোধের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে অনুরোধ করি। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'কলকাতায় আসুন, আপনার প্রশ্নের জবাব দেবো। বিদেশে দেশের ভেতরের ব্যাপার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা শোভন নয়।" শেখ হাসিনাকে বললাম, বিদেশে সাংবাদিক সম্মেলনে নিজে দেশের সেনাবাহিনীর এমন বিরূপ সমালোচনা না করলেই কি নয়? সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী রূঢ়ভাবে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন যে 'নেত্রীকে ও রকম কথা বলা' আমার উচিত হয়নি। গাফফার দীর্ঘদিনের বন্ধু। কিন্তু তাঁকে না বলে পারলাম না, 'গাফফার, আপনি কি হিসেবে এই সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছেন সেটা পরিস্কার বলে দিন। আপনি কি সাংবাদিক হিসেবে এর্সেছেন, না শেখ হাসিনার অভিভাবক হিসেবে, সেটা পরিস্কার হওয়া দরকার।' আবদুল গাফফার চৌধুরী নীরব হয়েছিলেন, কিন্তু শেখ হাসিনা বললেন, 'কি রেইটে রেইপ করছে তা গিয়ে দেখে আসুন।"

জানতে ইচ্ছে করে, শেখ হাসিনা কি এখনও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই রাজনীতি করে যাচ্ছেন? তাঁর প্রতিশোধ কাদের বিরুদ্ধে? কবে, কি ভাবে এই প্রতিশোধ নেবেন? ১৯৯৬-২০০১ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে প্রতিশোধ নেননি কেন?

www.icsbook.info

জে.এন. দীক্ষিতের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)-এর সময় জে.এন. দীক্ষিত ছিলেন ভারতের ইস্ট পাকিস্তান ক্রাইসিস ডেস্কের ইনচার্জ। ১৯৭২-৭৫ সময়ে তিনি ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার। পরবর্তীতে তিনি ভারতের সচিব হন। মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়ামীলীগ সরকারের সদস্যদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে দীক্ষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সরকারের ওপর একটি বই লেখেন, যার নাম "লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড।" ২০০১ সালের মার্চ মাসে দৈনিক "প্রথম আলো"-এর সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যা উক্ত পত্রিকার মার্চ ২১,২২ ও ২৩, ২০০১ সংখ্যায় ছাপা হয়। দীক্ষিতের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপঃ

ক. মুক্তিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকা রাখতে না পারার দরুন শেখ মুজিবের মধ্যে অপূর্ণতার অনুভূতি ছিল।

খ. মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতাদের প্রভাব কমিয়ে আনার জন্যই তিনি (শেখ মুজিব) পাকিস্তান পন্থী খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখকে গুরুত্ব দেন।

গ. মুক্তিযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের কারো কারো ব্যাপারে শেখ মুজিবের অবচেতন মনে সন্দেহ ছিল।

ঘ. ১৯৭২-এর শেষের দিকে শেখ মুজিব ও মুজিবনগর নেতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক খুব একটা ইতিবাচক ছিলো না।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়েও শেখ মুজিবের কিছুটা সন্দেহ ছিল।

চ. এক সময় তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য। এছাড়া দেশ বিভাগের সময়ও (১৯৪৭) পাকিস্তান মুসলিমলীগের যুব শাখার নেতা ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্তও তাঁর মতাদর্শে দ্বিজাতিতত্ত্বের কিছু প্রভাব থেকে গিয়েছিল।

ছ. তাঁর একটা বেশ আত্মমর্যাদাবোধও ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের সংগে বাংলাদেশের একটা ভারসাম্যমূলক দূরত্ব বজায় থাকা উচিত।

জ. তিনি বাঙালী মুসলমান হিসাবেও পরিচিতি চেয়েছিলেন।

ঝ. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েছিলেন মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার মতো একটি মুসলিম দেশ হিসাবে।

ঞ. তাঁর কাছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ছিল একটি বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠি, যাদের স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত জোরালো মুসলিম পরিচয় থাকবে।

ট. ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদারদের আত্মসমর্পনের দিন জেনারেল ওসমানীকে বহনকারী বিমানটিকে এমন একটি গতিপথে পাঠানো হয়েছিলো যাতে

www.icsbook.info

তিনি সময়মত ঢাকা পৌছাতে না পারেন এবং ভারতীয় সেনা কমান্ডাররাই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেন।

ঠ. শেখ মুজিব বা কামাল হোসেন কেউই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না।

ড. তিনি মনে করতেন পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক তৈরী করে বাংলাদেশের ওপর ভারতের অতিরিক্ত প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভবপর।

ঢ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপে তিনি খুশী হননি, যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা অনিবার্য ছিল। ভারতের ব্যাপারে তাঁর সংশয় ছিল।

ণ. ইসলামী জাতীয়তাবাদের শিকড় কখনোই তাঁর মন থেকে পুরোপুরি উৎপাটিত হয়ে যায়নি।

ত. ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী মুক্তির পর শেখ মুজিব ভারতীয় বিমানে চড়ে দেশে ফিরতে অস্বীকার করলে ভারতের অনেকেই তখন বলেছিল, "ভালবাসার একটা সামান্য নিদর্শন যিনি গ্রহণ করতে পারেননা, তার জন্য এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল?

থ. তিনি চেয়েছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতা। এজন্যই তিনি আওয়ামীলীগ ভেঙে বাকশাল গড়েছিলেন।

দ. সেনাবাহিনীতে প্রচুর প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানপন্থীকে তিনি ঠাঁই করে দিয়েছিলেন, এই ধারণা থেকে যে ওরা বেশী সুশৃংখল হবে।

ধ. এমন কিছু লোককে তিনি কাছে চেয়েছিলেন, যারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক সহযোগিতার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সরকার ও সেনাবাহিনীতে এজাতীয় কিছু লোক পেলে মুজিবনগর গোষ্ঠির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান শক্ত হবে। তিনি এটাও মনে করতেন যে, এক সময় এদেরকে দিয়ে তিনি মুজিবনগর গোষ্ঠিকে অপসারণও করতে পারেন।

জে.এন. দীক্ষিতের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর। এরকম আর অসংখ্য বইপুস্তক ও প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, যা থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যাইই হোক, উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য জে.এন.দীক্ষিত-এর Liberation And Beyond নামক গ্রন্থ এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ২০০১ সালের ২১, ২২ ও২৩ মার্চ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

আমার ফাঁসি চাই

বাংলাদেশে কেউ কেউ বলেন যে, জননেতা বা জন নেত্রীদের ঘুষদূর্নীতি, আত্মসাৎ, গোপন অর্থসম্পদ, লোভলালসা, হিংসা প্রতিহিংসা, মিথ্যাচার-শঠতা, নীচুতা-হীনন্মন্যতা স্বজনপ্রীতি, শাদ্দাদী বিলাসব্যসন, দাম্পত্য বৈকল্য-যৌনতা, নেশা-আসক্তি ইত্যাদি বিষয়কে প্রকাশ্যে আনা উচিত নয়, কারণ এগুলো তাঁদের "ব্যক্তিগত ব্যাপার"। কিন্তু প্রায়শ:ই দেখা যায় যে যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্ব স্ব পক্ষের নেতানেত্রীদের "ব্যক্তিগত ব্যাপার" গোপন রাখতে খুবই আগ্রহী বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষের নেতানেত্রীদের অনুরূপ "ব্যক্তিগত ব্যাপার" ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করে দিতেও মহা উৎসাহী। তাঁদের কথা হলো, "আমাদের নেতা বা নেত্রীর গোপন কথা ফাঁস করা যাবেনা, কিন্তু প্রতিপক্ষের নেতা বা নেত্রীর সব গোপন কথা সাড়ম্বরে ফাঁস করাই হলো জাতির জন্য অপরিহার্য।"

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে, একজন মানুষের যৌন আচরণ পারিবারিক আচরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রতিটি আচরণ ও মনোবৃত্তির মধ্যদিয়েই তাঁর রুচি, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধের প্রকাশ ঘটে। একটা মানুষের সকল আচরণ ও বৈশিষ্ট পরস্পর এমনই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যে তার কোন একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করার কোনই সুযোগ নেই। কারণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য তাবৎ কর্মকান্ডে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহের প্রভাব কোন না কোনভাবে পড়তে বাধ্য।

আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হন তাহলে জাতীয় স্বার্থেই তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও কর্মকান্ডের সকল দিক প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা (Accountability)-রও অপরিহার্য দাবী বটে। এজন্যই পৃথিবীর কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশেই নেতা নেত্রীর যৌন জীবন থেকে শুরু করে ব্যাংক ব্যালেন্স পর্যন্ত কোন কিছুই গোপন রাখার কোন রেওয়াজ নেই।

যেমন, ঘুষ-দূর্নীতি-স্বজনপ্রীতির দায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট চুন ডু হোয়ান ও রো তায়ে উ-এর প্রকাশ্য বিচার ও প্রাণদণ্ড হয় (যদিও বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়না। বিপুল অর্থসম্পদ আত্মসাতের কাহিনী ফাঁস হলে ফিলিপিন্স ছেড়ে পালাতে হয় ফার্ডিন্যান্ড মার্কোস দম্পতিকে। জনৈকা দেহজীবিনী ক্রিস্টিন কিলারের সঙ্গে বৃটেনের তদনীন্তন সমর মন্ত্রী লর্ড প্রফুমোর যৌন সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং পরিণামে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের গোটা মন্ত্রী সভারই পতন ঘটে। বৃটেনের যুবরাজ চার্লস, রাজকুমারী এ্যান কিংবা প্রিন্সেস ডায়ানা কারো

www.icsbook.info

কোন কথাই কি গোপন আছে? মনিকা লিউনিস্কিসহ বিভিন্ন নারীর সংগে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের যৌন সম্পর্কের ব্যাপারের প্রতিটি খুটিনাটি পর্যন্ত আদালতে আলোচিত হয় এবং তা বিশ্বের সমস্ত পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হয়, উপক্রম হয় ক্লিনটনের ইম্পীচমেন্টেরও। ২০০০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির পরাজয়ের এটাই ছিলো প্রধান কারণ। মহামতি লেনিন, যোসেফ স্ট্যালীন, বেনিটো মুসোলিনী, এডলপ হিটলার, জওহরলাল নেহরু, জন এফ. কেনেড়ী প্রমুখ জননায়কদের যৌন সম্পর্কের ব্যাপার পর্যন্ত অপ্রকাশ্য বা অনালোচিত থাকেনি।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অফিসে আড়িপাতার অপরাধেই (ওয়াটারগেট কেলেংকারী) মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিচার হয়েছিলো এবং তাঁর অকাল পতন ঘটেছিলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর বোন ফাতিমা জিন্নাহর বদমেজাজও ছিলো বহুল আলোচিত বিষয়। সৌদী আরবের রাজপরিবারের শাদ্দাদী বিলাস ব্যসন, যৌন আতিশয্য, দ্বিরাচার (Double Dealing) ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে লিখিত হয়েছে ডেজার্ট রয়্যাল, ডটার্স অব অ্যারাবিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ। অখন্ড পাকিস্তানের শেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সর্বক্ষণই বুঁদ হয়ে থাকতেন মদ আর মেয়ে মানুষের নেশায়, যার ফলে জুলফিকার আলী ভুট্টো চক্রের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিলো তাঁকে দিয়ে যেকোন হটকারী কাজ করিয়ে নেওয়া। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সংগে ক্রিস্টিন কিলারের সম্পর্কসহ কোন ব্যাপার গোপন ছিলোনা। ইন্দিরা গান্ধীও সমালোচিত হয়েছিলেন পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর বাড়াবাড়ীর জন্য, ক্ষমতার অপব্যবহার করে মারুতি শিল্প গোষ্ঠিসহ বিভিন্ন সম্পদ অর্জনে পুত্রকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। ভারতের অপর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যে প্রতিদিন নিয়মিত নিজের মূত্র নিজেই পান করতেন, সেটাও পত্রপত্রিকা কখনো চেপে রাখেনি। অবিশ্বাস্য হলেও বলা হচ্ছে যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদও নাকি গোপনে মদ্যপান করতেন। ভারতের শীর্ষ নেতাদের সংগে মাফিয়া ডনদের সম্পর্ক লেনদেনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তো সারা বিশ্বব্যাপীই রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিলো।

আর বাংলাদেশেও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অর্থসম্পদ আহরণ, যৌন কর্মকান্ডময় তাঁর সন্তানের যথার্থতা নিয়েও যদি সরস আলোচনা হতে পারে, তা হলে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেইবা তা হতে পরবেনা কেন? এরশাদওতো একদা এদেশের রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন এবং এখনও একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান আছেন।

বস্তুত কোন জননেতা বা নেত্রীর চরিত্র, স্বভাব, মেজাজ ও দোষগুণের কোন উপসর্গই আলোচনা সমালোচনার উর্ধ্বে হতে পারেনা। কারণ নেতা বা নেত্রীর বৈশিষ্ট, চরিত্র, স্বভাব, আচরণ ও মেজাজের প্রতিটি দিকই সংশ্লিষ্ট দল, সরকার, প্রশাসন, কর্মসূচী, রাষ্ট্র ও জনগণের ভাগ্য ইত্যাদির ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। যেমন, একজন নেতা

www.icsbook.info

বা নেত্রী যদি অর্থ লোলুপ হন, তাহলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এই লালসা চরিতার্থ করবেনই, ঘুষ-দুর্নীতি আত্মসাতে নিমগ্ন হবেনই, ঘুষের বিনিময়ে বিকিয়ে দেবেনই জাতির স্বার্থ, নিজের কুকীর্তি বহাল রাখার স্বার্থে প্রশয় দেবেনই অন্যদের ঘুষ দূর্নীতি এবং আত্মসাৎকৃত ও অন্যায়লব্ধ অর্থসম্পদ রক্ষার জন্য হবেনই বেপরোয়া ও স্বৈরাচারী। উগান্ডার ইদি আমিন থেকে ফিলিপিন্সের মার্কোস পর্যন্ত বিশ্বের অসংখ্য ব্যক্তিত্বই এর উদাহরণ। একই ভাবে একজন নেতা বা নেত্রী যদি ক্ষমতার জন্য অন্ধ উন্মত্ত হন, তাহলে ক্ষমতা পাওয়া এবং ক্ষমতা পেলে তা রক্ষার জন্য হেন অন্যায় ও নৃশংস কাজ নেই, যা তিনি করতে পারবেন না। ক্ষমতার স্বার্থে তিনি গণতন্ত্র মৌলিক অধিকার ইত্যাদিতে অবলীলায় হত্যা করতে পারবেনই, পারবেনই যে কোন ইতর কাজ করতেও। তেমনি কোন নেতা বা নেত্রীর পারিবারিক, দাম্পত্য বা যৌন জীবনে যদি কোন সমস্যা, বৈকল্য বা বিকৃতি থাকে, তাহলে তাও তাঁর মনমেজাজের ওপর প্রভাব ফেলবেই, তিনি খিটখিটে ও ধৈর্যহারা হবেনই, হবেনই বদমেজাজী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হয়তোবা সমকামীও। সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণেও রাষ্ট্রীয় কমকান্ডে পড়বেই তার প্রভাব। নেতা বা নেত্রী যৌন বিকৃতির শিকার বা যৌন লালসাগ্রস্থ হলে, তা চরিতার্থ করার চিন্তাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখবেই, সমস্ত চিন্তা চেতনা ও সবারমধ্যে কিছু না কিছু বিকৃতি থাকবেই এবং তার প্রভাব পড়বেই দল রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ওপর।

তবে, একজন নেতা বা নেত্রী সম্পর্কে উত্থাপিত বক্তব্য বা অভিযোগ অবশ্যই সত্যি হতে হবে। মিথ্যা বা কল্পিত তথ্য দিয়ে কোন নেতা বা নেত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার অধিকার কারোরই কখনো থাকতে পারেনা।

মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টু এমনিতে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী বা এলিট নন। কিন্তু তিনি দেশব্যাপী আলোচনায় চলে আসেন "আমার ফাঁসি চাই" শীর্ষক বইটি লেখার পর। ইতিমধ্যেই বইটির লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা ও বিক্রি হয়ে গেছে এবং এর বিষয়বস্তুও দেশেবিদেশে কারোরই আর অজানা নেই।

বইটিতে যে অসংখ্য ছবি ছাপা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রেন্টু ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা একদা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠতম মানুষ ছিলেন। শেখ হাসিনা ছাড়াও, শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, কন্যা পুতুল প্রমুখের সঙ্গেও রয়েছে রেন্টুদের অনেক ছবি। অনেক ছবিতে শেখ হাসিনা রেন্টুর কন্যাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। রেন্টুর স্ত্রী নাজমা আখতার ময়না দীর্ঘদীন শেখ হাসিনার বাস ভবনে তাঁর সার্বক্ষণিক একান্ত সহচরী ছিলেন।

সম্ভবত ১৯৯৮ সালের দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন অজ্ঞাত কারণে রেন্টুদের ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং রেন্টু ও তার স্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।

www.icsbook.info

অতঃপর ১৯৯৯ সালে উল্লেখিত বইটি প্রকাশিত হলে সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বইটির কোন কোন বিষয় অসত্য বা বানোয়াট তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করায় অনেকেই ধারণা করতে পারেন যে, বইটির বক্তব্য অপ্রিয় হলেও হয়তো খুব একটা অসত্য নয়।

এটা হতেই পারে যে মতিউর রহমান রেন্টুকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করায় তিনি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে এই বইটি লিখেছেন এবং অনেক অসত্য ও অতিরঞ্জিত তথ্য প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায় আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব বা বুদ্ধিজীবীরা যদি বইটির কোন কোন বক্তব্য মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন, তাহলে জনগণের পক্ষে সহজ হতো সত্য মিথ্যা নিরূপন করা। কিন্তু তাঁরা সেটা করেননি। অবশ্য পাত্তা না দেওয়াও একদিক থেকে ভালো ষ্ট্রাটেজী বটে।

যাইই হোক, এ বইটির মাধ্যমে মতিউর রহমান রেন্টু যে সব বিষয় জনসমক্ষে হাট করে খুলে দিয়েছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. ১৯৮১ সালের ২৩ ও ২৫ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির তিন তলায় সেমিনার কক্ষে সেনাবাহিনী কতিপয় কর্মরত ও সাবেক কর্মকর্তাদের এক জরুরী বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আওয়ামীলীগ নেতা কর্নেল শওকত আলী (অবঃ) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা ও হত্যাকালীন ও হত্যা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কর্নেল শওকত (অবঃ) জানান যে প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম গেলেই সেখানকার জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে তাঁকে হত্যা করা হবে। কর্নেল শওকত আরো জানান যে ৬ দিন আগে ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমনকারী নেত্রী শেখ হাসিনা এই হত্যা পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত আছেন। কর্নেল শওকত জিয়া হত্যার বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই গোপন বৈঠকে কর্নেল গাফফার, মেজর নাসির, ক্যাপ্টেন হাফিজসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। (পৃষ্ঠা ৮২-৮৩, আমার ফাঁসি চাই)।

২. জিয়া হত্যার পর বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তদানীন্তন সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা ও এরশাদের মধ্যে ৪/৫ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। (পৃষ্ঠাঃ ৮৯ গ্রাগুক্ত)।

৩. কিন্তু এরশাদ শেখ হাসিনার হাতের মুঠোয় থাকতে না চাওয়ায়, ১৯৮৩ সালের জানুযারী মাসের শেষের দিকে শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নেন যে, এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার স্বার্থে ছাত্র হত্যা করাতে হবে এবং তা করাতে হবে পুলিশ বা আর্মিকে দিয়েই। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয় আর্মড পুলিশের

www.icsbook.info

তদানীন্তন কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে। লস্করের সঙ্গে ছাত্র হত্যা করানোর নীলনক্সা চূড়ান্ত করা হয় এবং নীলনক্সা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ছাত্রদের একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। মিছিলটি দোয়েল চত্বরের কাছে এলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হাফিজুর রহমান লস্করের নির্দেশে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি ছোঁড়ে এবং জয়নাল ও জাফর নামে দু'জন ছাত্র নিহত হয়, আহত হয় অনেকে। তখন শেখ হাসিনা এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ইস্যুতে এরশাদ বিরোধী কর্মসূচী দেবেন বলে জানালে এরশাদ শেখ হাসিনাকে কতিপয় সুবিদা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে সমঝোতা করেন। এভাবেই কাজে লাগানো হয় জয়নাল ও জাফরের প্রাণদানকে। (পৃষ্ঠাঃ ৯২-৯৫, প্রাগুক্ত)।

৪. ১৯৮৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত আর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে শেখ হাসিনা পুনরায় ছাত্র হত্যা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তদনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারী ৩০/৪০ জন ছাত্রলীগ কর্মী মিছিল বের করলে হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে স্থিরকৃত পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়ট পুলিশের একটি লরী মিছিলের ওপর তুলে দেওয়া হয় এবং দেলোয়ার ও সেলিম নামক দুজন ছাত্রের দেহ থেতলে রাস্তার সঙ্গে মিশে যায়। রেন্টু ছাত্র হত্যার খবর শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছালে তিনি খুশী হয়ে বলেন 'সাবাস'। (পৃঃ ৯৬-৯৮, প্রাগুক্ত)।

৫. ১৯৮৪ সালের ৩মে ধানমন্ডি ৩২ নং রোডস্থ বঙ্গবন্ধু ভবনে শেখ হসিনা কথা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলেন, "এটা একটা বর্বর, নরপিশাচ, উচ্ছৃঙ্খল, লোভী, বেয়াদব বাহিনী। এই বাহিনীর আনুগত্য নেই, শৃখলা নেই, মানবিকতা নেই, মান্যগন্য নেই, নেই দেশপ্রেম। এটা একটা দেশদ্রোহী অসভ্য হায়েনার বাহিনী। তোমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথা বল। সারা বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো এতো ভদ্র নম্র সভ্য বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল বাহিনী খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর মানবিকতা বোধের তুলনা চলেনা। কি অসম্ভব সভ্য আর নম্র তারা। পঁচিশে মার্চ (১৯৭১) রাতে তারা এলো, এসে আব্বাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে) সেলুট করলো, মাকেও সেলুট করলো, আমাকেও লেলুট করলো। সেলুট করে তারা (আব্বাকে) বললো, স্যার আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। অন্য কিছুর জন্য নয়। সত্যিই পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। ২৬ মার্চ দুপুরে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে যখন পাকিস্তানী আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল টিক্কা খান নিজে এসে আব্বাকে ও মাকে সেলুট দিয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে সাথে আব্বাকে বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে নেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরী। আপনি তৈরী হয়ে নেন এবং আপনি

www.icsbook.info

ইচ্ছা করলে ম্যাডাম (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন। আব্বা মার সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান আর্মি যতদিন ডিউটি করেছে, এসে প্রথমেই সেলুট দিয়েছে।" (পৃঃ ৯৮-৯৯, প্রাগুক্ত)। শেখ হাসিনার বক্তব্যসত্য হলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ পর্যন্ত তাঁর বাসভবনে ছিলেন এবং সেদিনই কোন এক সময় তাঁকে বিশেষ বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে আপোষ ও আন্তরিকতার মধ্যে।

৬. যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও লক্ষ মা বোনের ইজ্জত লুট করেছিলো, সেই বাহিনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার আরো বক্তব্য, "শুধু তাই নয়, আমার দাদীর সামান্য জ্বর হয়েছিল। পাকিস্তানীরা হেলিকপ্টারে করে টুঙ্গিপাড়া থেকে দাদীকে ঢাকা এনে পি.জি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। জয় (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে। আমাকে প্রতি সপ্তাহে সি এম এইচ-এ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে) নিয়ে ওরা (পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী) আমাকে চেকআপ করাতো। জয় হওয়ার এক মাস আগে ওরা আমাকে সি এম এইচে ভর্তি করিয়েছে। '৭১ সালে (মুক্তিযুদ্ধের সময়) জয়ের জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তানী আর্মিরা খুশীতে মিষ্টি বাটোয়ারা করেছে এবং জয় হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানীরাই বহন করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানীরা দুই জীপে করে সাথে যেতো। নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত।" (পৃঃ ৯৯, প্রাগুক্ত)। শেখ হাসিনার উপরোক্ত বক্তব্য সমূহ থেকেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সম্পর্ক কিরূপ ছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭. ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসক এরশাদ তাঁর ক্ষমতা দখলকে হালাল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলে বেগম জিয়া নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে জনৈক ব্যবসায়ী এস.আই.চৌধুরী (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী)-এর গুলশানের বাসায় তৎকালীন ডিজিএফ আই প্রধান বিগ্রেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে শেখ হাসিনার এক গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকে জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে বিগ্রেডিয়ার মাহমুদুল হাসান শেখ হাসিনাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আওয়ামীলীগের নির্বাচনে সমস্ত খরচ তাঁরা বহন করবেন এবং শেখ হাসিনাও প্রতিশ্রুতি দেন যে তাহলে তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন। পরবর্তীতে, একই বাসায় ডিজিএফআই এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে শেখ হাসিনা নির্বাচনী ব্যয়ের তিনগুণ অর্থ দাবী করেন। বিগ্রেডিয়ার মাহমুদুল হাসান এক ঘন্টার সময় চেয়ে নেন। ঘন্টা দুই পর ব্যবসায়ী এস.আই.চৌধুরী নিজে শেখ হাসিনার ধানমন্ডির ৩২নং রোডের বাসায় এসে টাকা ভর্তি নয়টি বস্তা নামিয়ে দিয়ে যান। এরপর শেখ হাসিনা দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন। পাতানো নির্বাচনে যথারীতি এরশাদ বিপুলভাবে বিজয়ী হলেন। এরপর শেখ হাসিনা

www.icsbook.info

কৌশল হিসাবে পাল্টা পার্লামেন্ট ডাকার হুমকি দিলে ব্যবসায়ী এস.আই.চৌধুরী আরো তেরো বস্তা টাকা শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দেন। অনুমান করা হয় প্রথম বারে শেখ হাসিনাকে দেওয়া হয় দশ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় বারে দেওয়া হয় পনের কোটি টাকা (পৃঃ ১০১-১০৪, প্রাগুক্ত)। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় কি ভিত্তিতে শেখ হাসিনা ১৯৮৬ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং এরশাদের রাবার ষ্টাম্প পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী হন।

৮. যাইই হোক, ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এরশাদ উৎখাত হয়ে গেলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১-এর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলো। দলের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার কথিত পদত্যাগ এবং দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরীকে দিয়ে ওই পদত্যাগপত্র ছিঁড়ে ফেলার ঘোষণা দেওয়ানোর (লেখকের ভাষায় পুরো ব্যাপারটাই নাটক) বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে বইটির ১১১-১১২ পৃষ্ঠায়।

৯. ওই বছর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করে। এই পর্যায়ে "শেখ হাসিনা বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির ও ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধী অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে দোয়া নিয়ে আসার জন্য বলেন"। (পৃঃ ১১২, প্রাগুক্ত)। বলাবাহুল্য, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ঠিকই অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন।

১০. ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে তথাকথিত গণ আদালত ১০টি অভিযোগে অধ্যাপক গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা করে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক) এর রায় কার্যকর করার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে শেখ হাসিনা তাঁর চাচাতো ভাই (শেখ নাসিরের পুত্র) শেখ হেলাল এর ইন্দিরা রোডস্থ বাসায় অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। উভয়ে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, আওয়ামীলীগ ও জামায়াত পরস্পরকে সমর্থন দেবে এবং যৌথভাবে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। শেখ হাসিনা এই বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযমকে আশ্বাস দেন যে, তিনি জাহানারা ইমামদের অর্থাৎ ঘাদানিকের আন্দোলন নস্যাৎ করে দেবেন (পৃঃ ১১৫, প্রাগুক্ত)। বলাবাহুল্য, এর পর উভয় দল বাস্তবিকই বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ মিলেমিশে আন্দোলন শুরু করে। গোলাম আযমের ফাঁসির ইস্যুও ধামাচাপা পড়ে যায়।

www.icsbook.info

১১. ১৯৯২ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছিলো এতে সভাপতিত্ব করার কথা। কয়েকজন সরকার প্রধান সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় এসেও গিয়েছিলেন। তবে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তখনো এসে পৌঁছাননি। ঠিক এমনি সময়ে শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নেন যে, হিন্দুবিরোধী রায়ট লাগিয়ে দিয়ে নরসীমা রাওয়ের ঢাকা আগমনকে ঠেকিয়ে দিতে হবে এবং বানচাল করে দিতে হবে সার্ক সম্মেলনকে। এজন্য ঢাকা শহরে গুন্ডা বদমাশ ও সন্ত্রাসীদের হাতে নগদ পাঁচ লাখ টাকা তুলে দেওয়া হয়। আওয়ামীলীগ কর্তৃক নিয়োজিত এই সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূর্ব পার্শ্বস্থ শিববাড়ী মন্দির ও ঢাকেশ্বরী মন্দির লুট করে। লুটপাট চালানো হয় রামকৃষ্ণ মিশনে ও পুরানো ঢাকার বিভিন্ন মন্দির ও হিন্দুদের ব্যবসা কেন্দ্র সমূহে। ঢাকায় হিন্দু নির্যাতন চলছে বলে নরসীমা রাও আর ঢাকা এলেন না এবং ফলে পন্ড হয়ে গেলো সার্ক সম্মেলন (পৃঃ ১১৫-১১৮, প্রাগুক্ত)। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের রায়টের কারণ ও উৎস সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া। অবশ্য সংখ্যালঘুরা এ ব্যাপারটা সম্পর্কে কতোটা ওয়াকেবহাল তা কে জানে।

১২. ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারী ছিলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। আওয়ামীলীগ মোহাম্মদ হানিফকে মেয়র পদে মনোনয়ন দেয়। এই পটভূমিতে ২৫ জানুয়ারী (১৯৯৪) বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমান টোকনের ধানমন্ডিস্থ বাসায় শেখ হাসিনার সঙ্গে অধ্যাপক গোলাম আযমের দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযম বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ার ওয়াদা করেন এবং বিনিময়ে শেখ হাসিনা জামায়াতের ওপর হামলা না চালানোর আশ্বাস দেন (পৃঃ ১২৩, প্রাগুক্ত)। এইই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আওয়ামীপন্থী নেতা বুদ্ধিজীবীরা কেন যে জামায়াত ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন, তা বুঝা খুবই দুস্কর নয় কি?

১৩. ৩০ জানুয়ারী (১৯৯৪) মেয়র নির্বাচনের দিন কতিপয় আওয়ামীলীগ নেতা নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে বলে মিথ্যা তথ্য দিলে বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়েও শেখ হাসিনা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার নির্দেশ দেন। রাত ১০টায় নির্বাচন কেন বাতিল করা হয়নি, এ জন্য শেখ হাসিনা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ধমক দিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। এখন আমরা কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করবো?" সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা উল্টে যান এবং নির্বাচন বাতিল না করতে নির্দেশ দেন (পৃঃ ১১৫-১২৬ প্রাগুক্ত)।

১৪. ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনা থেকে শুরু হয় উত্তর বঙ্গের দিকে শেখ হাসিনার ট্রেন যাত্রা। যেতে যেতে প্রায় ২০টি ষ্টেশনে শেখ হাসিনা বক্তৃতা করেন।

www.icsbook.info

যেহেতু সবকটি বক্তৃতারই বিষয় ছিল একটাই, সেহেতু রাত ১০টার দিকে সাংবাদিকরা আর তাঁদের কামরা থেকে নেমে আসার প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। কিন্তু এতে শেখ হাসিনা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন এবং বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বাহাউদ্দিন নাসিমকে সাংবাদিকদের কামরা লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, "গুলির পর তোমরা রটিয়ে দেবে যে আততায়ীরা আমাকে হত্যা করার জন্যই গুলি করেছিলো।" নির্দেশ মোতাবেক, ট্রেন ইশ্বরদী ষ্টেশনে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে বাহাউদ্দিন নাসিম স্বয়ং তাঁর পিস্তল দিয়ে সাংবাদিকদের কামরা লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি করেন। শেখ হাসিনার নির্দেশ মতোই ঈশ্বরদী ষ্টেশনে আমির হোসেন আমু বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যার জন্য গুলি চালানো হয়েছিলো বলে অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন। পরদিন (২৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় পত্রপত্রিকায় পরিকল্পনা মোতাবেক শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গুলি চালানে হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হলে বগুড়া সার্কিট হাউসের ভিভিআইপি রুমে বসে শেখ হাসিনা ও তাঁর সফর সঙ্গীরা হাসাহাসিতে ফেটে পড়েন এবং হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত দেন। (১৩০-১৩২, প্রাগুক্ত)। এই ঘটনা থেকে পরবর্তী কালের বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণ ও শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণের ঘটনাবলীর আসল রহস্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

১৫. ১৯৯৪ সালের ২ অক্টোবর শেখ হাসিনা রংপুরের ধরলা নদীর ফেরীর মাঝিদের ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম দেন, এজন্য যে, বেগম খালেদা জিয়া যখনই এপথে আসবেন, তখনই মাঝনদীতে ফেরী ডুবিয়ে দিয়ে মাঝিরা তাঁকে হত্যা করবে। কাজ হলে মাঝিদের আরো ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ারও অঙ্গীকার করেন শেখ হাসিনা। (পৃঃ ১৩২-১৩৫, প্রাগুক্ত)।

১৬। ১৯৯৪ সালের ৯ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর, পঙ্কজ ও হিমাংশু দেবনাথসহ ৯ জনকে ডেকে এনে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়ে বলেন যে, আগামী ২০ ডিসেম্বর তিনি পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করলে ছাত্রলীগ যেন দেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং প্রতি দিন অন্ততঃ ৫/১০ টা করে লাশ ফেলে দিতে থাকে; যে পর্যন্ত না খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটে। হরতালের সময় যেসব সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষতঃ সচিব পায়ে হেটে অফিসে যান তাদেরকে উলঙ্গ করে ফেলার জন্য শেখ হাসিনা দায়িত্ব দেন ছাত্রনেতা আলমকে। তিনি আলমকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে বলেন, কাজ হলে আরো ৩০ হাজার টাকা দেবেন। আলম দোয়েল চত্বরের কাছে সত্যিই একজনকে উলঙ্গ করে ফেলে এবং পরদিন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হলে শেখ হাসিনা খুবই আনন্দিত হন। (পৃঃ ১৬১-১৬২, প্রাগুক্ত)।

১৭. ১৯৯৬-এর জানুয়ারীতেও সেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ নাসিমকে শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ জানান ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু জেনারেল নাসিম তখন রাজী হননি (পৃঃ ১৬৩ প্রাগুক্ত)।

www.icsbook.info

১৮. ১৯৯৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী, সকাল ৯টা। সুধা সদনে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, শামীম ওসমান, অজয়কর, পঙ্কজ, নিরঞ্জন সাহা প্রমুখ ১১ জনকে নিয়ে এক গোপন বৈঠক করেন বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৫ ফেব্রুয়ারির কৌশলগত নির্বাচনকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে পান্থপথে অনুষ্ঠিতব্য শেখ হাসিনার জনসভা ও প্রদান মন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে মিছিলের ব্যাপারে। শেখ হাসিনা প্রথমে ওই ছাত্রনেতাদেরকে নিয়ে নিম্নলিখিত শপথ বাক্য পাঠ করান; "আমরা শপথ নিতেছি যে, যে কোন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ণ করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করলাম এবং আমরা আরো শপথ করছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোন ধরনের নির্দেশ, তা যতো কঠিনই হোক না কেন, জীবন দিয়ে পালন করবো।" শপথ পাঠ শেষ হলেই শেখ হাসিনা বলেন, "আজই আমি দশ পুলিশের লাশ চাই। পাঁচ মিলিটারির লাশ চাই।" এসময় শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ একটা ব্রিফকেস নিয়ে আসেন। শেখ হাসিনা তা খুলে ৫০০ টাকার ১০ বান্ডিল নোট ছাত্রনেতার হাতে দিয়ে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ণের হুকুম দেন। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে ক্ষিপ্ত আওয়ামীলীগাররা বিআরটিসির দু'টি বাসসহ বেশ কিছু সংখ্যক যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়। (পৃ: ১৬৪-১৬৬)।

১৯. ১৯৯৬ সালের ২২ জুন অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। এই উপলক্ষ্যে জেনারেল নুরুদ্দীন খান (অব:) ও জেনারেল সালাম (অব:)-এর উদ্যোগে শেখ হাসিনার সঙ্গে তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল নাসিমের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বনানীর কুসুম ভিলায়। এই বৈঠকে জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে কথা দেন যে, অত:পর সেনাবাহিনী শেখ হাসিনার নির্দেশেই চলবে। ১৯৯৬ সালের ১৮ মে জেনারেল নাসিম রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমানের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে চলে গেলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন। এমতাবস্থায়, শেখ হাসিনা সারা দেশ থেকে ঢাকার দিকে সৈন্য মার্চ করানোর জন্য জেনারেল নাসিমকে নির্দেশ দেন এবং জেনারেল নাসিমকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে গোপনে গিয়ে ওঠেন কক্সবাজারে। এই দ্বন্দ্বে জেনারেল নাসিম পরাজিত, বরখাস্ত ও গ্রেফতার হলে, শেখ হাসিনা আর কখনো জেনারেল নাসিমের নাম মুখেও আনেননি (পৃ: ১৭৪-১৮০, প্রাগুক্ত)।

২০. ১২ জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পূর্বে একদিন রাত একটায় সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে তদানীন্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুহেনার এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যাইই হোক, এই নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা জামায়াত, জাসদ (রব) ও এরশাদের জাপার সমর্থন নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। জামায়াতের সমর্থন পাওয়ার জন্য শেখ হাসিনা তাঁর বেয়াই মোশাররফ হোসেনের উত্তরান্থ বাড়ীতে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে এক গোপন বৈঠক করেন এবং তাঁকে সমর্থনের বিনিময়ে জামায়াতকে ২টি মহিলা আসন প্রদানের অঙ্গীকার করেন, যদিও এই অঙ্গীকার তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেননি (পৃ: ১৮০-১৮৬, প্রাগুক্ত)।

www.icsbook.info

২১. ১৯৯৬ সালের ৭ জুলাই শেখ রেহানা গনভবনে এসে বড়বোন শেখ হাসিনাকে বলেন, তাঁর ৫ জন লোককে মন্ত্রী বানাতে হবে। এনিয়ে দুই বোনের মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া ও চিৎকার পাল্টা চিৎকার শুরু হলে গণভবনের ষ্টাফ ও সিকিউরিটিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। শেখ রেহানা রাগ করে আমেরিকা চলে গেলে ক'দিন পর শেখ হাসিনা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন এবং সাব্যস্ত হয় যে শেখ রেহানা শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করবেন এবং শেখ হাসিনার পর শেখ রেহানাই হবেন বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী (পৃঃ ১৯০-১৯১, প্রাগুক্ত)।

২২. ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকী ২ জন শিখ, ৩ জন মাড়োয়ারী ও ২ জন ভারতীয় বাঙালীকে নিয়ে গণভবনের ৫নং বৈঠক খানায় নিয়মিত মিটিং করতেন। একদিন এই মিটিং বিকাল ৩ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সাত ঘন্টা স্থায়ী হয়। পরদিনই শেয়ার বাজারের আকস্মিক পতন ঘটে এবং এই ৭ ব্যক্তি উধাও হয়ে যায়। শেয়ার বাজারের সেই ধ্বস পরবর্তী ৬/৭ বছরেও কাটিয়ে ওঠা আর সম্ভবপর হয় না। (পৃঃ ১৯২-১৯৩, প্রাগুক্ত)।

২৩. ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা যতো আন্দোলন বা হরতালের কর্মসূচী দেন, তার প্রতিটিতেই ৩/৪ জন মানুষ গুলি খেয়ে মারা যেতোই। এদের কেউই কিন্তু আওয়ামীলীগের পরিচিত কর্মী ছিলোনা। প্রতি কর্মসূচির দুদিন আগে ঢাকা শহরের পেশাদার খুনীদের কাছে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং বলা হতো, "লাশ চাই। মানুষের লাশ। যে কোন মানুষের লাশ।" লাশ পড়ার পর আরো টাকা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো। যে পর্যন্ত লাশের খবর না আসতো, ততোক্ষণ পর্যন্ত শেখ হাসিনা চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যে থাকতেন। একবার সচিবালয় ঘেরাও উপলক্ষে বেলা ২টা পর্যন্তও কোন লাশ না পড়ায় বিজয় নগরের স্যাং গার্ডেন নামক চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে অপেক্ষা করতে থাকা শেখ হাসিনা খুনীদের নগদ এক লাখ টাকা দিয়ে বললেন, লাশ তাঁর চাইই। বেলা তখন ৩টা। গুলিস্তান বাস ষ্ট্যান্ডের কাছে খুনীরা অপেক্ষ করতে লাগলো। ঢাকার বাইরে থেকে একটা বাস এসে থামলো। অমনি গর্জে উঠলো খুনীদের আগ্নেয়াস্ত্র। ঘনটাস্থলেই লুটিয়ে পড়লো ১৪/১৫ জন সম্পূর্ণ নিরীহ যাত্রী। তিন জন মরেই গেলো। শেখ হাসিনা আনন্দিত হয়ে খাবার খেলেন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কান্নার ভান করে ছবি তুললেন এবং সে ছবি জাতীয় পত্রপত্রিকায় ছাপা হলো। (পৃঃ ২১৯-২২২, প্রাগুক্ত)। বলাবাহুল্য, এভাবে হত্যাকান্ড ঘটিয়ে, সরকার হত্যা করেছে বলে সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াটাই ছিলো কৌশল।

২৪. বইটির ২৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মালিকানাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, বিদেশী ব্যাংকে জমা রাখা তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের বিবরণ।

এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু "আমার ফাঁসি চাই" বইটিতে উল্লেখ করেছেনঃ বিএনপি দলীয় কমিশনার পদপ্রার্থী আজিজ ৭ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে শুনে আনন্দিত শেখ হাসিনার হিন্দি গান ও নৃত্য করতে থাকা এবং রুমালে গ্লিসারিন

www.icsbook.info

মাখিয়ে কান্নায় ছবি তোলা (পৃঃ ১২৮), জাহানারা ইমামের মৃত্যু সংবাদে উল্লাসিত হয়ে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে চাওয়া (কারণ জাহানারা ইমামের জনপ্রিয়তার প্রতি ছিলো তাঁর প্রচন্ড ঈর্ষা) (পৃঃ ১৩০)। প্রায় ২০ বছর স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন না করা ও স্বামীর প্রতি আচরণ (পৃঃ ১৪০), জনৈক চিহ্নিত রাজাকারের ছেলের সঙ্গে মেয়ে পুতুল এর বিয়ে দেওয়া (পৃঃ ১৪৪), মানুষকে দেখানোর জন্য অবেলায় প্রকাশ্যে নামায পড়তে শুরু করা (পৃঃ ১৫০), বেগম খালেদা জিয়াকে "গোলাপী" বলে ব্যঙ্গ করা (পৃঃ ১৬৯), বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েলসিংকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিল (পৃঃ ১৬৯), পুরানো রাশিয়ান মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয়বাবদ অর্থলাভ, (পৃঃ ২০১), গঙ্গার পানি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ট্রানজিটের ব্যাপারে জ্যোতি বসুর পরামর্শ (পৃঃ ২০৯-২১০), নামে পুরুষ কিন্তু কাজে পুরুষ নয় এমন ব্যক্তি বিধায় জিল্লুর রহমানকে দলের সাধারণ সম্পাদক বানানো (পৃঃ ২২৬), হরগঙ্গা কলেজের সাবেক ভিপি মৃণাল কান্তি দাসের সঙ্গে আপত্তিকর সম্পর্ক এবং শেখ হাসিনার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক আছে বলে মৃণালকান্তির প্রচার (পৃঃ ২২৯-২৩১), নিহত চাচা শেখ নাসেরের স্ত্রীর পরামর্শে সপ্তাহে দু'দিন ছুটি ঘোষণা (পৃঃ ২৪৫), উৎকোচ নিয়ে চিফ কনারভেটর অব ফরেষ্ট নিয়োগ (পৃঃ ২৪৭) ইত্যাদি বহু ঘটনার কথা।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, মতিয়ুর রহমান রেন্টু শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাসীন অবস্থায় পেয়েছেন মাত্র দেড় বছর। ফলে, শেখ হাসিনা তাঁর আমলের পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে আরও কতো কি করেছেন, তার উল্লেখ এই বইতে নেই। রেন্টু, শেখ হাসিনা ও তাঁর আত্মীয় স্বজনদের অর্থসম্পদ আহরণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা প্রথম দেড় বছরেরই, পরবর্তী সাড়ে তিন বছরের অর্থসম্পদের বিবরণ এখানে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। বলাবাহুল্য, পরবর্তী সাড়ে তিনবছরের ঘটনাবলী যোগ করা হলে বইটির আয়তন হয়তো বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ হয়ে যেতো।

বইটির বক্তব্য মিথ্যা হলে তা ক্যাটেগরিক্যালী তুলে ধরা কি একান্তই অপরিহার্য নয়? একজন অবসংবাদিত জাতীয় নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার বা তাঁর ওপর কলংক আরোপের অধিকার কারোরই কি থাকতে পারে? থাকা উচিত?

অন্নদাশঙ্কর রায় ও অন্যান্য

অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই শুধু নন, একজন সাবেক আইসি এম কর্মকর্তা ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্বও বটে। একজন দেশপ্রেমিক ভারতীয় ও হিন্দুতো বটেই। তিনি "ভারতের মাটিতে মুসলিম বিদ্বেষ আঞ্চলিক রোগে পরিণত হয়েছে" শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন "ভারতের মাটিতে মুসলিম বিদ্বেষ এখন এন্ডেমিক (আঞ্চলিক রোগ বিশেষ) হয়ে গেছে। লোকে আর গান্ধীবাদের ওপর ভরসা রাখেনা। পুলিশকেও বিশ্বাস করেনা; ...আজকাল যত্রতত্র যখন তখন যে কোন ছলে হিন্দু মুসলমানের সংঘাত বাধে। সকল ঘটনাই ভারতের

www.icsbook.info

মাটিতে।...আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করতে পেরে কোনো একটি দল মিছিল বার কওে ও আওয়াজ দেয় 'গদ্দর হায় মুসলমান। ভেজো উসকো পাকিস্তান'। .....এর দিন চারেক পরেই দাংগা। দাংগার উপলক্ষ যাইই হোকনা কেন, উদ্দেশ্য ছিলো সব মুসলমানকে পাকিস্তান চালান দেওয়া। তাহলে তাদের জমিবাড়ী দখল করে ভোগ করা যেত। এ খেলা আমরা কলকাতাতেও দেখছি। .....নাম না করলেও সকলে বুঝবেন যে, আমাদের এই সেক্যুলার রাষ্ট্রে এমন দল আছে, সে মুসলমানকে পারলে বিতাড়ন করবে, না পারলে হিন্দু বানাবে। তাও যদি না পারে তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুতে পরিণত করবে।" এই হচ্ছে ভারত সম্পর্কে অন্নদা শঙ্কর রায়ের সমীক্ষা।

ভারতের বর্তমান ট্রেন্ড ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনন্দা কে, দত্তরায় তাঁর "গো-হত্যা নিয়ে রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ আশ্রয় পশ্চিম বাংলা, কেরালা এবং পাঁচটি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র একে তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে এসেছে। যদি তা ব্যর্থ হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হবে। আর এভাবেই ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে ঢেকে যাবে ভারত। কেবল তার হিন্দু পরিচয় বিকৃত করবে শিক্ষাকে, প্রত্যাখ্যান করবে বিজ্ঞানের সব সুফল ও গবেষণাকে। উৎসাহিত করবে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সামাজিক রাজনীতিকে। সামাজিক গোত্রভেদকে আরো তীব্র করবে।"

বিশিষ্ট সিপিএম নেতা ও ত্রিপুরার শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকার ২০০৩ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশে আসেন এবং সব দেখেশুনে বলেন, "বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক মানুষদের হাজার সালাম। কারণ তারা ভারতের হিন্দু সন্ত্রাসীদের ফাঁদে পা দেয়নি। ভারতের হিন্দু সন্ত্রাসীরা কখনো বাবরী মসজিদ, কখনো গুজরাট ইস্যুর সৃষ্টি করে এই উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চায়। ওই সব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শয়তানরা এখানে কি করতে চায়, তা আমরা জানিনা। কিন্তু এদেশের জনগণ যে ব্যাপক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে তার প্রমাণ আমরা দেখেছি।" অথচ এই সাম্প্রতিক সময়েই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা ও তাদের মুসলমান নামধারী বন্ধুরা এখানে নাকি দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতার তান্ডব।

৮ জুন ২০০৩ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ডিএইচপি) নেতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া গৌহটিতে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "ভারতের উচিত বাংলাদেশ আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া। .....যদি ভারত সরকার এব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আসামে আগুন জ্বেলে দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের উচ্ছেদ করবে।"

নিউইয়র্ক থেকে এনা পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, অ্যান্টি সেমেটিজম, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা এই চারটি মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশন ২০০৩ সালের যে বার্ষিক

www.icsbook.info

রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে বিশ্বের ২২টি দেশকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা হরনকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানও এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ এর অন্তর্ভূক্ত নয়। এবছর যে ২২টি দেশের বিরুদ্ধে ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘনের অভিযোগ উঠেছিলো, সেগুলো হচ্ছে আফগানিস্তান, বেলারুশ, বেলজিয়াম, বার্মা, চার্ম, উত্তর কোরিয়া, মিসর, ফ্রান্স, জর্জিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, লাওস, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়া, সৌদী আরব, সুদান, তুর্কমেনিস্তান ও ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের কোনই অভিযোগ নেই।

অথচ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা এবং তাঁদের মুসলিম নামধারী বন্ধুরা প্রতিনিয়ত বলেই চলেছেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন হচ্ছে, তেমন সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার নজীর নাকি দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। গত ১৫ মে (২০০৩) সাংবাদিক সালাম আজাদ জেনেভায় "বাংলাদেশ জ্বলছে" শীর্ষক একটি ভিডিও বানিয়ে তা প্রদর্শন করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর লোমহর্ষক দমন নিপীড়ন চলছে। কাদের কথা সত্যি?

৯ জনু (২০০৩) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ "কালো দিবস" পালন করে এবং দাবী তোলে যে বাংলাদেশে সংবিধান থেকে "বিসমিল্লাহ" ও "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" উঠিয়ে দিতে হবে। তাঁরা সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে ৩ কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান রয়েছে। সুতরাং সরকারকে তাঁদের দাবী মানতেই হবে। নইলে কিভাবে তা মানাতে হয় সেটা তাঁরা দেখিয়ে দেবেন। আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রাজ্জাক, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, সুধাংশু শেখর হালদার, জাসদ নেতা নূর আলম জিকু, গনফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক প্রমুখ এই সভায় উপস্থিত থেকে ঐক্য পরিষদের এসব বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

এর কদিন আগে (২০ মে ২০০৩) উক্ত পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পরিষদ নেতারা ঘোষণা করেন "আমরা (হিন্দুরা) ভারতের সহায়তায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম। বর্তমান শত্রুদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশের হিন্দুদের আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশ ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ আমাদের সরাসরি সহায়তা করছে। আর প্রতিবাদ নয় এবার প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। এই লড়াইয়ে জেতার জন্যই আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ গড়ে তুলেছি এবং দেশেবিদেশে এর শাখা ও অংগসংগঠন ছড়িয়ে দিয়েছি।" বিচারপতি কে.এম. সোবহান এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২০০৩ সালের ১৩ জুন ভারতের উপ প্রধানমন্ত্রী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা এল কে আদভানী নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সেন্টারে গেলে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং এতে বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি আহবান জানানো হয়।

www.icsbook.info

হটলাইন বাংলাদেশ নামক একটি সংগঠনের পরিচালক মিস রোজালিন কোষ্টা এর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন টাইমস-এ প্রকাশিত "টেরর ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক এর নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, ভোলা অঞ্চলের ৯৮% হিন্দু নারীই মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে। মিস কোষ্টা নাকি আরও জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে অমুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ৩৩%। মুসলমানদের অত্যাচারে এখন তা কমে গিয়ে ৯.৯%-এ এসে ঠেকেছে।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন পার্বত্য সার্বভৌম জুম্মুল্যান্ড কায়েম এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীন বঙ্গভূমি কায়েমের জন্য যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে, তাদের প্রতিও এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী বাঙালী সমর্থন দিচ্ছেন।

এই যে মিস কোষ্টারা বলেছেন, ৯৮% হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে, একথা কি সত্য? এই ধর্ষিতা নারীদের একটা তালিকা কি কেউ দিতে পারবেন? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩% বা একতৃতীয়াংশ অমুসলমান ছিল, এই পরিসংখ্যান কি সঠিক? হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ দাবী করছে বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ কোটি অমুসলমান রয়েছে, অথচ মিস কোষ্টা বলেছেন এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.৯%, অর্থাৎ ১ কোটি ৩০ লাখেরও কম? কোন পরিসংখ্যানটি তাহলে গ্রহণযোগ্য? গুজরাটের হিন্দুদের মতো বাংলাদেশের কোন তথাকথিত মৌলবাদী অর্থাৎ দাঁড়ি টুপি ওয়ালা ধর্মপ্রাণ মুসলমান নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হিন্দুদের হত্যা করার জন্য ছুটে চলেছে, এরকম একটি ছবিও কেউ কি দেখাতে পারবেন? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো বাংলাদেশের কোন ইসলামী সংগঠন কখনোই কি হিন্দুদের হত্যা, নির্যাতন বা বিতাড়ন করার জন্য কখনো কোন লিখিত বক্তব্য বা বক্তৃতা দিয়েছে? এই অস্ত্র হাতে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, সরকারকে দেখিয়ে দেওয়ার ধমকি দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের প্রতি প্রকাশ্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, এসব রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা হাই ট্রিজনের পর্যায়ে পড়ে না কি? এরপরও কিন্তু বাংলাদেশে সরকার বা জনগণ এরূপ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তো দূরের কথা, সামান্য আইনী ব্যবস্থা পর্যন্ত নিচ্ছেনা। তা সত্বেও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুসলমানরাই কি সাম্প্রদায়িক? আর যারা এসব কান্ড করছে তারাই কি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ? বাংলাদেশকে খন্ডিত করে জুম্মুল্যান্ড ও বঙ্গভূমি কায়েমের জন্য লড়াইকারীদের প্রতি সমর্থন প্রদানই কি দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা?

এসব ব্যাপারে কি বক্তব্য বাংলাদেশের বিবেকবান এলিটদের? কি বক্তব্য সচেতন সিভিল সমাজের?

www.icsbook.info

শেষ কথা

একথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন দেশ বা দেশের আপামর জনগণের প্রতি আমাদের কোনই বিদ্বেষ নেই। ভারত বা ভারতের জনগণের প্রতিতো নয়ই। ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে সাহায্য সহায়তা প্রদান করেছিলো, তা না পেলে মাত্র ৯ মাসে মুক্তি ছিনিয়ে আনা আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হতোনা। অনেকে অবশ্য বলেন যে ভারত সেদিন আমাদের সাহায্য করেছিলো, আমাদের প্রতি কোন প্রেমপ্রীতি থেকে নয়, বরং তাদের চিরশত্রু পাকিস্তানকে খন্ডিত ও হীনবল করার স্বার্থেই। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিকোন থেকে সেটাই কি স্বাভাবিক ছিলোনা? আমি যদি একজন হিন্দু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতাম, তাহলে আমিও কি ঠিক তাইই করতামনা, যা তখন ইন্দিরাগান্ধী করেছিলেন? ভারতকে বিভক্ত ও হীনবল করার কোন সুযোগ পেলে পাকিস্তানও কি তা কখনোই ছাড়তো? ছাড়বে?

এটাও আমরা জানি যে, ভারতের ৮৫% এরও বেশি মানুষ অচুৎ হরিজন দলিত নিপীড়িতেরই পর্যায়ভূক্ত। আমরা এটাও জানি, ভারতের বহু অঞ্চলের মানুষই সংগ্রাম করছে দিল্লির কায়েমী শাসকশোসকদের কবলমুক্ত হওয়ার জন্য। এটাও আমাদের জানা যে, অখন্ড পাকিস্তানের আমলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীদের যে অবস্থা ছিলো, ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের বর্তমান অবস্থা তার চেয়ে মোটেই ভালো নয়। কোলকাতার অর্থনীতি সংস্কৃতির ওপরতো এখন মাড়োয়ারি-গুজরাটিও মুম্বাই-মাদ্রাজেরই একচ্ছত্র দাপট। এদের সকলের সঙ্গে আমরা পরম একাত্মতা বোধ করি।

কিন্তু যে বা যারা আমাদের রক্তমূল্যে অর্জিত বাংলাদেশের অর্থনীতি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, সামাজিক ভারসাম্য ইত্যাদির কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, করছে বা করবে, তাদের প্রতি আমাদের ক্ষোভ তো থাকবেই। এরূপ ক্ষোভ যে কোন দেশের যে কোন শোষিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয় কি? আর সকলেই জানেন যে হিন্দু আর হিন্দুত্ববাদ এক ব্যাপার নয়। হিন্দুত্ববাদ হচ্ছে একটি উগ্র অসহিষ্ণু সহিংস সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, যার উদগাতা ভারতের বজরং, শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসপি, বিজেপি প্রমুখ। বাংলাদেশের কেউ কেউও এর অনুসারী বটে। যেহেতু হিন্দুত্ববাদ একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, সেহেতু এর ব্যাপারেও যে কোন বিবেকবান মানুষের আপত্তি থাকাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের হোক আর বাংলাদেশেরই হোক, সাধারণ বিবেকবান হিন্দু বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিদ্বেষ বা অনীহার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। বাংলাদেশের হিন্দু

www.icsbook.info

বৌদ্ধ খ্রীষ্টানরা অবশ্যই মুসলমানদের সমকক্ষ নাগরিক। তাঁদেরকে কোনভাবে হেয় প্রতিপন্ন করাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। এই পুস্তক সত্যকে উদ্ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত করার একটি বিনীত প্রয়াস মাত্র।

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম কথাটির অর্থ হলো ধর্মদ্রোহিতা। ইংরেজী অভিধানে এর অর্থ হলোঃ Not pertaining to or connected with religion (যা ধর্মের বিশ্বাসের সম্পর্কিত নয়), Not belonging to a religious order (যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়), Rejects all forms of religious faith (যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়) ইত্যাদি। অসাম্প্রদায়িকতা (Non-communalism) ও ধর্ম নিরপেক্ষতা আদৌ এক ব্যাপার নয়। অসাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে স্ব স্ব ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ হওয়া এবং তারই সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর বা ধর্মদ্রোহী হওয়ার অধিকারও যে কারো থাকতে পারে বটে, যদিও বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশেও ধর্মদ্রোহিতা স্বীকৃত নয়। কিন্তু, অন্যান্য ধর্মের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রেখে শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংস্রতা ও আক্রমণকে কি আদৌ ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম বলা যায়? সেক্যুলারিজম মানে কি শুধু ইসলাম দ্রোহিতা? অথচ আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষরা কি ঠিক তাইই করছেননা? সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষদেরতো ঢালাওভাবে সকল ধর্ম বিশ্বাসেরই বিরোধিতা করার কথা, সকল ধর্মের গোঁড়া বা মৌলবাদীদের সমালোচনা ও নস্যাৎ করার কথা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যাঁরা শঠতা বা একদেশদর্শিতার আশ্রয় নেন, তাঁদের সমালেচনাও হওয়া উচিত নয় কি?

জাতির বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামীলীগের বঙ্গবন্ধুতে পরিণত করা অনুচিত, অগ্রহণযোগ্য।

একথাও আমরা আগেই বলেছি এবং আবার বলছি যে, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, আওয়ামীলীগের প্রতিপক্ষীয় নেতা-নেত্রী বুদ্ধিজীবীরা সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এবং যাবতীয় দোষত্রুটি, ঘুষ-দূর্নীতি, অন্যায়-অপরাধ, লোভ-লালসা, শঠতা-চক্রান্ত, বিদেশী স্বার্থের সেবাদাসত্ব, চারিত্রিক স্খলন ইত্যাদির উর্দ্ধে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে তাঁদের চরিত্র ও সমস্ত কর্মকান্ডও অবশ্যই প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া অপরিহার্য। এঁদের বিষয়ে যাঁরা ভালো জানেন, যাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই কাজটা করতে এগিয়ে আসবেন। আসা উচিত, অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, যে কোন দল বা ব্যক্তির সমালোচনা অবশ্যই হওয়া উচিত শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র দালিলিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে, অন্ধ বিদ্বেষ, অন্ধভক্তি বা কোন কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিতে নয়।

স্বভাবতঃই এই পুস্তকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদারদের যারা প্রতিপক্ষ, তাদের প্রসঙ্গ অবতারনার কোন সুযোগ ছিলোনা। সেটা ভিন্ন পুস্তকের প্রতিপাদ্য।

www.icsbook.info

লেখক পরিচিতি

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ বর্তমান মায়ানমারের নামটো নামক ছোট্ট শহরে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জন্ম। পৈত্রিক নিবাস চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই থানার মায়ানী গ্রাম। ইংরেজী সাহিত্যে বি.এ আনার্স ও এম.এ। তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ। কর্মজীবনে কলেজের অধ্যক্ষ, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সচিব, স্বাধীনতার পর পর গঠিত বাংলাদেশ সরকারের সাউথ ইস্ট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল জোন নং-১ এর সচিব, ক্রিসেন্ট শিল্পগোষ্ঠির প্রশাসক, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউএসএ-এর প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি। দৈনিক পত্রিকার নিয়মিত কলামিস্ট। প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক। এক সময়ে প্রগতিশীল রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। ১৯৮০ সালে ইউনেস্কোর নোমা রিচারেসী এওয়ার্ড লাভ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি কনফারেন্সের কো-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, মালি, সেনেগাল, ভারত, নেপালসহ অসংখ্য দেশ ভ্রমণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইম্পেরিয়ালিজম ইন মিডল ইস্ট অ্যান্ড দ্যা ওডিসি অব প্যালেস্টাইন : বামপন্থীদের ভ্রান্তি ও বাংলাদেশের বিপ্লব, রাজনীতিকোষ, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, এরাও দানব ওরাও দানব, যা বলিব সত্য বলিব, ডাক দিয়ে যাই ইত্যাদি।